প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

১৯/১, মনসাতলা লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩ হইতে হেনা চক্রবর্তী বি.এ.
কর্তৃক প্রকাশিত ও কার্ডিনাল প্রিণ্টার্স, ৪/১এ, সনাতন শীল লেন,
কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।
প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীহরেশ্বর কাহালী

পরম পূজনীয়

জ্যাঠাবাবুকে

সূচীপত্র

উপমা জয়দেবস্য

পর্বতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়ের কথাই সর্বাগ্রে মনে আসে। অনুরূপভাবে কাব্যের ক্ষেত্রে উপমা প্রয়োগ নৈপুণ্য প্রসঙ্গে যাঁর কথা রসিক পাঠকের মনে সকলের আগে না এসে পারে না, তিনি ভারতের কবিকুল চূড়ামণি কালিদাস। 'উপমা কালিদাসস্য'—বাস্তবিক কথাটা যে কতখানি সত্য—মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, রঘুবংশ, ঋতুসংহার, বিক্রমোর্বশী প্রভৃতি যে কোন গ্রন্থের কিয়দংশমাত্র পাঠের পরই নিতান্ত অসচেতন পাঠকের পক্ষেও তা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। 'শকুন্তলা' গ্রন্থের পঞ্চম অঙ্কে যেখানে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার অনুপম রূপ যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট অথচ পূর্বের ঘটনা বিস্মরণ হেতু তাঁকে গ্রহণে অসমর্থ—দুষ্মন্তের এই দ্বন্দ্বময় মানসিকতাকে কালিদাস কুন্দ ফুলের মধুলোভে আকৃষ্ট অথচ ফুলের অন্তরস্থিত তুষারের জন্য তা গ্রহণে অসমর্থ ভ্রমরের সঙ্গে উপমিত করেছেন ঃ

> ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
> প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্ন বেতি ব্যবসন্।
> ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
> ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্ ।।

কিংবা, রঘুবংশের সপ্তম সর্গে রাজকন্যা ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভার বর্ণনা প্রসঙ্গে কালিদাসের সেই বিখ্যাত শ্লোকটি, যেখানে ইন্দুমতীকে সঞ্চারিণী দীপশিখার সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে—

> সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
> যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
> নরেন্দ্র মার্গাট্ট ইব প্রপেদে
> বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥

অথবা কুমারসম্ভবে হর-পার্বতীর বিবাহের পর যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান শেষে পার্বতীর প্রতি পুরোহিতের উপদেশ বাণী পার্বতী কিরূপভাবে গ্রহণ করলেন তাঁর বর্ণনা প্রসঙ্গে—

আলোচনান্তং শ্রবণে বিতত্য
পীতং গুরোস্তদ্বচনং ভবান্যা।
নিদাঘকালোল্বণ তা পয়েব
মাহেন্দ্রমম্ভঃ প্রথমং পৃথিব্যা।।

—শ্লোকাদি পাঠকমাত্রকেই মোহিত করে। সুতরাং এরপর কালিদাসের উপমা প্রয়োগ নৈপুণ্য যদি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়, তবে আশ্চর্যের আর কিছু থাকে না। কত সহজে যে কবির কাছে উপমাগুলি ধরা দিয়েছে তা লক্ষ্য করলে যথার্থই বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য কবি জয়দেব!

পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যগ্রন্থটির গুরুত্ব প্রধানতঃ সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য ভক্ত পাঠকের কাছেও এ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং এ হেন 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের উপমা সম্পর্কিত আলোচনা, বিশেষতঃ যে বৈশিষ্ট্যটি একজন বিশ্বখ্যাত কবিকে এনে দিয়েছে অকুণ্ঠ সাধুবাদ এবং যে বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে তাঁর সম্বন্ধে সৃষ্টি হয়েছে প্রবাদ বাক্যের—এ হেন ক্ষেত্রে জয়দেবের প্রসঙ্গে সেই বহুল পরিচিত প্রবাদ বাক্যটির প্রয়োগ স্বাভাবিক কারণেই যে পাঠকের কৌতূহল সৃষ্টির কারণ হবে তা বলা বাহুল্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে, জয়দেবকে কালিদাসের স্থলাভিষিক্ত করার অভিপ্রায়ে বর্তমান আলোচনার অবতারণা নয়। সকলপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও জয়দেবের কাব্যে ইতস্ততঃ যে উপমা প্রয়োগের অপূর্ব নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়েছে তার আস্বাদন করা। একথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, কালিদাসের তুলনায় সে নৈপুণ্য কিছু পরিমাণে হয়ত বা ম্লান বলে

অনুভূত হবে। তবু পর্বত বলতে যেমন কেবলমাত্র হিমালয়কেই বোঝায় না, অনুরূপভাবে উপমা প্রয়োগের ব্যাপারেও কালিদাস হয়ত বা অদ্বিতীয়, কিন্তু একমাত্র শিল্পী নন নিঃসন্দেহে। এ কারণেই কালিদাস সম্বন্ধে প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত অভিমতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেই বর্তমান আলোচনার অবতারণা।

'মুগ্ধমধুসূদন' নামাঙ্কিত তৃতীয় সর্গের একটি শ্লোকে, যেখানে কেশব রাধা বিরহে বিলাপরত, সেখানে রাধার রোষারক্ত আঁখিদ্বয় বিশিষ্ট মুখমণ্ডল, বিরহী কৃষ্ণের কাছে রক্তপদ্মের উপর ভ্রমণরত ভ্রমর বলে প্রতিভাত হয়েছে বলে কবি বর্ণনা করেছেন ঃ

চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রূ কোপভরেণ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ॥ (৫)

বাস্তবিক, রোষারক্ত আঁখি রক্তপদ্মেরই অনুরূপ। আর কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমরের সঙ্গে আঁখিতারকার যে কেবল বর্ণগত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বর্তমান তাই নয়, উভয়ের প্রকৃতিগত চাঞ্চল্যের ইঙ্গিতও এই প্রসঙ্গে কবি দিয়েছেন। কৃষ্ণ রাধিকাগত প্রাণ। সুতরাং রাধিকার ক্রুদ্ধা মূর্তিও তাঁর কাছে অতিশয় রমণীয় রূপ ধারণ করে। বর্ণিত উপমাটির মধ্য দিয়ে কবি সে দ্যোতনারও আভাষ দান করেছেন।

'স্নিগ্ধমধুসূদন' শীর্ষক চতুর্থ সর্গের একটি শ্লোকে কৃষ্ণ বিরহে কাতরা শ্রীরাধিকার রূপটি কবি অপূর্ব নৈপুণ্য সহকারে রূপায়িত করেছেন—

আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে
তাপোঽপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালাকলাপায়তে।
সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে হী কথং
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়ঞ্শার্দ্দূল বিক্রীড়িতং॥ (১০)

অরণ্যে দাবানল শিখায় উদ্বিগ্ন, ব্যাঘ্রসন্ত্রাসিত হরিণীর সমতুল

বিরহিণী রাধিকা। তাঁর কাছে আপন আবাসস্থল অরণ্যের ন্যায়; প্রিয়সখীসকল ব্যাধজালবৎ, আপনার শ্বাস-বায়ু দাবানল শিখা সদৃশ, আর কন্দর্প সমাকারে শার্দ্দূল রূপে প্রতিভাত। সুতরাং তিনি অশান্ত৷ প্রাণস্বরূপ যে দয়িত, তার বিরহে আকুলা নায়িকা যে, কোন কিছুতেই শান্তিলাভ করে না—বর্ণিত চিত্রটিতে কবি এই চিরন্তন সত্যটিকেই রূপায়িত করেছেন। যে আবাসস্থল একদা দয়িতের মিলনে পরিণত হয়েছিল স্বর্গে, আজ সেই শূন্য আবাসস্থল দুর্গম, ভয়ঙ্কর অরণ্যের অনুরূপ। যে প্রিয়সখীরা একদা ছিল প্রাণাধিক—জীবনের সুখ-দুঃখ সকল প্রকার অবস্থার সহচরী, আজ তাদের উপস্থিতিও নায়িকার কাছে অসহনীয়। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে বর্ণিত উপমাগুলি সুপ্রযুক্ত।

শ্রীরাধিকার বিরহক্লিষ্ট মূর্তিটিকে কবি অপর একটি শ্লোকেও মূর্ত করে তুলেছেন--

দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালং।
নয়ন নলিনমিব বিদলিত নালং॥ (১৪)

মৃণাল বিচ্ছিন্ন সজল পদ্মের ন্যায় রাধিকার আঁখিদ্বয় কৃষ্ণের দর্শন আশায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে অশ্রুপাতে রত। পদ্ম যে কেবলমাত্র মৃণালদণ্ডের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তাই নয়, এটি এর সৌন্দর্যের অনেকখানি ধারকও বটে। অনুরূপভাবে, কৃষ্ণহীন রাধাকে কবি মৃণালহীন পদ্মের সঙ্গে উপমিত করে শ্রীরাধিকা যে কৃষ্ণের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল সেই ব্যঞ্জনা দান করেছেন। সেইসঙ্গে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে শ্রীরাধিকার সৌন্দর্যেরও যেন অনেকখানি হানি ঘটে। উভয়ের মিলনেই সৌন্দর্যের পূর্ণতা—এ ব্যঞ্জনাও প্রকাশিত।

একাদশ সর্গের একটি শ্লোকে প্রিয়তমা রাধিকার দর্শনে কৃষ্ণের উৎফুল্ল রূপটি বর্ণিত হতে দেখা গেছে—

তরলদৃগঞ্চলবলনমনোহর বদনজনিত রতিরাগং।
স্ফুটকমলোদর খেলিত খঞ্জন যুগমিব শরদি তড়াগং ॥ (২৭)

বস্তুত, এই শ্লোকে বর্ণিত উপমাটি সত্য সত্যই এক কথায় অপূর্ব। শরৎকালে নির্মল সলিল বিশিষ্ট জলাশয়ে বিকশিত পদ্মে ক্রীড়ারত খঞ্জনযুগলের ন্যায়, রাধিকাদর্শনে দয়িত কৃষ্ণের নয়নদ্বয় প্রিয়তমার মনোহর মুখমণ্ডলে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক রতিরাগ বৃদ্ধিতে সহায়তা ক'রল। এখানে কবি ক্রীড়ারত খঞ্জনযুগলের চাঞ্চল্যের সঙ্গে রাধিকাদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের নয়নদ্বয়ের চাঞ্চল্যের এবং শরৎকালের নির্মল সলিল বিশিষ্ট তড়াগের সঙ্গে কৃষ্ণের স্বচ্ছ আঁখিদ্বয়ের তুলনা করেছেন। বলা বাহুল্য যে, উভয় ক্ষেত্রেই উপমা সুপ্রযুক্ত ও যথাযথ হয়েছে। এই একই সর্গে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে—

শ্যামলমৃদুল কলেবর মণ্ডল মধিগত গৌর দুকূলং।
নীলনলিনমিব পীত পরাগ পটল ভর বলয়িত মূলং ॥ (২৬)

পীত পরাগ বেষ্টিত নীলকমলের মৃণালের ন্যায় পীত বসনের দ্বারা কৃষ্ণের শ্যামল কোমল কলেবর শোভিত। বহু ব্যবহৃত ও অতি পরিচিত উপমাও জয়দেব তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। যেমন, রাধাগত প্রাণ ও রাধাদর্শনে অভিলাষী শ্রীকৃষ্ণের রাধিকাদর্শনে যে আনন্দের অভিব্যক্তি ঘটে, তার সঙ্গে কবি চন্দ্রদর্শনে উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রের তুলনা করেছেন:

রাধাবদন বিলোকন বিকসিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গং।
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডলদর্শন তরলিত তুঙ্গ তরঙ্গং ॥
হরিমেকরসং চিরমভিলষিত বিলাসং।
সা দদর্শ গুরুহর্ষবশংবদবদনমনঙ্গ বিকাশং ॥ (২৪)

এখানে কৃষ্ণকে জলনিধির সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। রাধিকা উপমিত হয়েছেন চন্দ্রের সঙ্গে। উভয় ক্ষেত্রেই বর্ণগত সাদৃশ্য

বর্তমান। আর রাধিকাদর্শনে পুলকিত কৃষ্ণের চাঞ্চল্যের সঙ্গে কবি গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-মালার।

পরিশেষে, 'গীতগোবিন্দে' প্রযুক্ত অপর কয়েকটি অলঙ্কারের নিদর্শন গ্রহণ করা যেতে পারে। যদিও এগুলি অবিমিশ্র উপমার পর্যায়ে পড়ে না, তথাপি মূলতঃ এগুলিকে উপমারই ভিন্নতর প্রকাশ বলে অভিহিত করা যেতে পারে।[১] অষ্টম সর্গের একটি শ্লোকে কবিকে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ব্যবহার করতে দেখা গেছে—

তবেদং পশ্যন্ত্যাঃ প্রসরদনুরাগং বহিরিব
প্রিয়া পাদালক্তচ্ছুরিতমরুণচ্ছায় হৃদয়ং। (১০)

প্রেয়সীর পদের আলতায় রঞ্জিত কৃষ্ণের বক্ষ। যেন প্রেয়সী শ্রীরাধিকার প্রতি তাঁর হৃদয়ানুরাগেরই বহিঃপ্রকাশ। দ্বাদশ সর্গের একটি শ্লোকে কবিকে রূপক অলঙ্কার ব্যবহার করতে দেখা গেছে—

ভ্রমরচয়ং রচয়ন্ত মুপরি রুচিরং মম সম্মুখে।
জিত কমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্ম্মজন কমলকং মুখে॥ (২০)

রাধিকা তাঁর প্রফুল্ল কমল নিন্দিত মুখমণ্ডলে অলকাবলী অস্পষ্ট হওয়ায়, এবং সেজন্য সখীদের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়ায় তাঁর মুখ-কমলোপরি মনোহর অথচ স্থির ভ্রমর পংক্তির তুল্য অলকাবলী পরিস্ফুট করার জন্য দয়িত কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছেন। পরবর্তী শ্লোকে কবিকে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। স্বেদের

---

১ অপ্যয় দীক্ষিত তাঁর 'চিত্রমীমাংসা' গ্রন্থে বলেছেন :

উপমৈকা শৈলূষী সংপ্রাপ্তা চিত্রভূমিকা-ভেদান্।
রঞ্জয়ন্তী কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তদ্বিদাং চেতঃ॥

অর্থাৎ, 'উপমা হইল একমাত্র নটী—যে বিচিত্র ভূমিকা ভেদ লাভ করিয়া কাব্যরূপ রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করে এবং কাব্যবিদ্‌গণের চিত্ত রঞ্জন করে'।

দ্বারা অপগত ললাটচন্দ্রে চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় মৃগমদে মনোহর তিলক রচনার জন্য রাধিকা আপনার প্রাণবল্লভের নিকট অনুরোধ করেছেন ঃ

মৃগমদরস বলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে।
বিহিত কলঙ্ক কলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে ॥ (২১)

জয়দেবের কাব্যে অশ্লীলতা হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে অতি প্রকট রূপে আত্মপ্রকাশ করে কাব্যকে কিছু পরিমাণে নিন্দনীয় করে তুলে থাকতে পারে। কিংবা স্বেচ্ছাকৃত ধ্বনিচাতুর্য কাব্যের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে অনেক স্থলে হয়ত অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও জয়দেব একজন যথার্থ কবি ছিলেন, তাঁর সেই কবিত্বের পরিচয় কাব্যে প্রযুক্ত একাধিক উপমা এবং অন্যবিধ অলঙ্কারে নিঃসন্দেহে প্রকাশিত।

'বিলাসে'র কবি জয়নারায়ণ

'করুণানিধান বিলাস' খ্যাত এবং প্রসিদ্ধ ভূকৈলাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অধুনা বিস্মৃত মহাত্মা জয়নারায়ণ ঘোষাল ১১৫৯ সালের ৩রা আশ্বিন শুক্রবার (১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর) অধুনালুপ্ত গড় গোবিন্দপুর[১] অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল। জয়নারায়ণ ছিলেন তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান।

জয়নারায়ণের পিতামহ কন্দর্প ঘোষালের আদিনিবাস ছিল হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাকসাড়া নামক গ্রামে। ব্যবসার প্রয়োজনে তিনি সর্বপ্রথম গোবিন্দপুরে এসে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গোবিন্দপুর অধিকার করায় কন্দর্প ঘোষাল সপরিবারে পুনরায় বাকসাড়ায় ফিরে যান। এরপর কিছুদিনের জন্য গড়িয়া এবং বেহালায় বসবাসের পর ১১৬১ সালে স্থায়িভাবে খিদিরপুরে বসতি স্থাপন করেন।

মহাত্মা জয়নারায়ণ বিচিত্রমুখী প্রতিভার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। তাঁর সাহিত্য সাধনা ব্যতীত বৃহত্তর কর্মসাধনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাত্র পনের বছর বয়সেই তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী এবং ইংরিজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১১৭২ সালে জয়নারায়ণ বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার তদানীন্তন নবাব নাজিম মোবারক উদ্দৌলার (১৭৭০-১৭৯৩) অধীনে কর্মে নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এই দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন

১ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ যেখানে অবস্থিত, পূর্বে সেইস্থান পরিচিত ছিল গোবিন্দপুর নামে।

এবং ১১৭৫ সালে তিনি তদানীন্তন কলকাতার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জন সেক্সপীয়রের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। ১১৮৬ সালে জয়নারায়ণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তৎকালীন বাঙ্গালার গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১১৮৮ সালে দিল্লীর বাদশা মহম্মদ জাহান্দার শার কাছ থেকে জয়নারায়ণকে তাঁর কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধি আনিয়ে দেন এবং সেইসঙ্গে জয়নারায়ণ তিন হাজারী মনসবদার পদেও নিযুক্ত হন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পরেও জয়নারায়ণ কোম্পানীর নানাবিধ কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বনবিষ্ণুপুরের রাজা দামোদর সিংহের জমিদারী বন্দোবস্তে সক্রিয় সহায়তা; ১১৯৩ সালে ২৪ পরগণা জেলার জরিপ ও রাজস্বের সংস্কারে ২৪ পরগণার কালেক্টর সি, ক্যামাককে সক্রিয় সাহায্যদান, ১২০৩ সালে মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন নবাব বাবরজঙ্গ বাহাদুরের জমিদারীতে শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যাপারে সহায়তা করা ইত্যাদি।

জয়নারায়ণ তাঁর পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। এই অর্থে তিনি ত্রিপুরা, ভুলুয়া, বাখরগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, ২৪ পরগণা প্রভৃতি নানা স্থানে ভূসম্পত্তি কেনেন। এছাড়া খিদিরপুরের পৈতৃক বাসভবনের সন্নিহিত ১০৮ বিঘা নিম্নভূমিও তিনি কেনেন। এখানে তিনি পরিখাবেষ্টিত এক সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই স্থানটি 'ভূকৈলাস' নামে পরিচিত। জয়নারায়ণ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ পুরুষ। ভূকৈলাসে তিনি রক্তকমলেশ্বর, কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর এবং রাজেশ্বর নামে তিনটি শিবলিঙ্গ ব্যতীত, অষ্টধাতু নির্মিত পতিতপাবনী, পঞ্চানন মহাদেব, গঙ্গা, গণেশ, কার্তিক, সূর্য, রামসীতা প্রভৃতি মুর্তিও প্রতিষ্ঠা করেন।

১২০০ সালে তিনি কাশীতে 'করুণানিধান' নামে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহও স্থাপন করেন। এছাড়া তাঁর গুরু রঘুনাথ ভট্টের পবিত্র স্মৃতিতে কাশীতে নির্মিত 'গুরুধাম'ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহাত্মা জয়নারায়ণ কৃত নানাবিধ জনহিতকর কার্যাদির আলোচনা প্রসঙ্গে কাশীতে তাঁর নির্মিত হাসপাতাল উল্লেখ্য। অনাথ ও আতুরের উপযুক্ত চিকিৎসার উদ্দেশ্যেই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা সহরের দুঃস্থ-দুর্গত ও অবহেলিত নরনারীর দুর্দশা মোচনের মহৎ-উদ্দেশ্যে মহৎপ্রাণ জয়নারায়ণ এবং তাঁর পিতা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক ১২০১ সালের (১৭৯৪) ১৫ই আষাঢ় তারিখে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল রাইট হানবিলের কাছে আঠারটি সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণের ঘটনাটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত দরখাস্তের কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে[২] —

'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল তস্য পুত্র শ্রীজয়নারায়ণ ঘোষাল গরিব কাঙ্গালি লোকের প্রতিপালনার্থে হকিকত লিখিতেছি বাঙ্গালার কলিকাতা সহরের সমস্ত গরিবের মধ্যে প্রায় ৫০০ পাঁচসত গরিব জাহারা কানা খোড়া অতুর অচল ও পঙ্গু ব্যাধিগ্রস্থ অনাথা পিতা মাতা হিন ও পতিপুত্র বিহিন শক্তিরহিত শ্রম করিয়া আত্মভরণ পোষণ করিতে অযোগ্য সর্ব্বদা সহরের রাস্তাতে ও গলিতে বৃক্ষতলাতে বাস করিয়া থাকে যাহাদিগের মৃত্যু গাড়ি ও ঘোড়ার চপেটে ও অন্য অন্য অসদগতিতে তাহ-দ্দিগের মৃত্যু হইলে পরে সহরের মুরদাফরাস আসিয়া স্থানান্তর করিয়া ফেলিয়া দেয় ইহাতে যে যেমত জাতি শাস্ত্র সম্মত গতি হয় না এই অনাহুত অনাথা জিবের প্রাণ রক্ষার কারণ যদি শ্রীযুক্ত রাইট হানবিল গৌরনর জানেরল বাহাদুর সাহেবের

২ 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন,' ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলিত; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৪২); পৃষ্ঠা ২০১-২০৫ দ্রষ্টব্য।

অনুগ্রহ হয় ঐ সকল গরিব প্রতি দৃষ্টি করিয়া দুঃখ বিমোচন করেন তবে ইহাতে অত্যন্ত পূণ্য প্রতিষ্ঠা চিরকালের জন্যে জগত সংসারে থাকিবেক একারণ আমরা এসকল গরীব লোকের দুঃখ দুর করিবার নিমিত্যে ও সহরের উপকারের জন্যে বিস্তারিত দফাওয়ারিতে আপনাদ্দের বুদ্ধি ক্রমে নিচে লিখিতেছি'।

শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রেও জয়নারায়ণের আন্তরিকতা ও দুরদর্শিতা বিশেষতঃ সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্ময়কর বলেই বিবেচিত হবার যোগ্য। রাজা রামমোহন রায় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন এদেশে ইংরিজী শিক্ষা প্রবর্তনের গুরুত্ব অনুভব করে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের সঙ্গে পত্র বিনিময়ে নিযুক্ত ছিলেন, তারও প্রায় এক দশক পূর্বেই ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে দূরদর্শী জয়নারায়ণ এদেশে ইংরিজী শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে বারাণসীতে গরুড়েশ্বর মহল্লায় নিজের বাড়িতে সকল জাতির বালকের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ে ইংরিজী ব্যতীত হিন্দী, বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী, পাটীগণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ ও পুলিস আইন পড়াবার ব্যবস্থাও ছিল। সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরিজী শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রথম পথিকৃতের সম্মান নিঃসন্দেহে জয়নারায়ণের প্রাপ্য।

হিন্দী সাহিত্যের পুষ্টি সাধনেও জয়নারায়ণের প্রয়াস নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। পূর্বোক্ত বিদ্যালয়ে হিন্দী পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে তিনি মহাভারতের হিন্দী অনুবাদের ব্যাপারে কাশীর রাজা উদিতনারায়ণকে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ব্রজভাষায় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য রচনা করিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবির বর্ণনা—

কিছুকাল মৃজাপুরে করিয়া যাপন
কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের সোবল চরণ।

ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ করি গান
ব্রজের ভাষাতে তাহা করিল রচন।
শ্রীমহাভারত ভাষা কাশীরাজে কৈল
পঞ্চম বৎসরে তাহা পূরণ করিল।
সদস্য তাহাতে আমি নিযুক্ত রহিল
বাঙ্গালাতে কাশীদাসী সংক্ষেপ করিল।
স্বর্গ-আরোহণ পর্ব ধর্মের শাসন
শুনি স্তব্ধ মন দুখী জয়নারায়ণ।
শ্রীউদিতনারায়ণ বারাণসী পতি
ব্রজের ভাষাতে সাঙ্গ করিলেন পুথি।

পরিশেষে, জয়নারায়ণের সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাস্তবিক জয়নারায়ণ ছিলেন সে যুগের একজন প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক। জয়নারায়ণের সাহিত্যকীর্তি সংস্কৃত ও বাংলা এই দুই ভাষাতেই বর্তমান। তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে ১ম—শঙ্করী সঙ্গীত (সংস্কৃত শ্লোকে একাম্রকানন বিহারিণী ভগবতীর লীলা বর্ণনা), ২য়—ব্রাহ্মণার্চ্চনচন্দ্রিকা (বেদ-পুরাণ-তন্ত্র শাস্ত্রাদি থেকে ব্রাহ্মণ-অর্চনার বিধি-ব্যবস্থা), ৩য়—সংস্কৃত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত 'জয়নারায়ণ-কল্পদ্রুম'। ১৭১৪ শকাব্দে (১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি বাঙ্গালা পদ্যে কাশীর বিবরণ সম্বলিত 'কাশী খণ্ডে'র অনুবাদ করান। জয়নারায়ণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'করুণানিধান বিলাস (১৮১৩-১৪)।

দীর্ঘকাল কাশীতে বসবাসের পর মহাত্মা জয়নারায়ণ ৬৯ বৎসর বয়সে ১২২৮ সালের ২৫শে কার্তিক (১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ) কাশীতেই দেহত্যাগ করেন।

জয়নারায়ণ স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত একশত পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ 'কাশীখণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। এই অনুবাদকর্মে তাঁকে

সহায়তা করেছিলেন শূদ্রমণিবংশীয় নৃসিংহদেবরায়, নৃসিংহদেব রায়ের সহচর জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ, বলরাম বাচস্পতি, বক্রেশ্বর পঞ্চানন, রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, উমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার প্রমুখাদি। 'কাশীখণ্ড' অনূদিত হবার পর গ্রন্থশেষে জয়নারায়ণ স্বয়ং সমসাময়িক কাশীর এক অমূল্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। জয়নারায়ণ কাশীতে দীর্ঘকাল অবস্থানকালে কাশীর অবস্থা যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 'কাশীখণ্ডে'র উপসংহারে কয়েকটি মাত্র অধ্যায়ে তাই লিপিবদ্ধ করেছেন। কাশীস্থিত ঘাট, কাশীর ঘাটিয়া ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের বেদাধ্যয়ন, এখানে বসবাসকারী নানা জাতি, দেবমন্দির, কাশীবাসিনী ধর্মপ্রাণা রমণী, এঁদের ধর্মব্রতাদি অনুষ্ঠান ও গঙ্গাস্নানের বর্ণনা; কাশীস্থিত অট্টালিকা, সে সময়ে এখানকার দ্রষ্টব্যস্থল, সাধারণের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, এখানকার রমণীদের পরিধেয় বস্ত্র, সাম্বৎসরিক উৎসবানুষ্ঠান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জয়নারায়ণ নিষ্ঠাসহকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাস্তবিক, 'কাশী-পরিক্রমা'র লিপিকাল অনুযায়ী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কাশীর এক পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক চিত্র জয়নারায়ণের বর্ণনা থেকে লাভ করা যায়। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লিপি-কালের (১৮০৯) অন্ততঃপক্ষে ১২-১৩ বছর পূর্বেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন:

"রাজা বাহাদুরের লিপি-কৌশল—তাঁহার সত্যপ্রিয়তা। তাৎ-কালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা একশত বৎসরের যবনিকা তুলিয়া অবিকল কাশীর মূর্ত্তিটী আমাদের চক্ষে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে, কালে এই চিত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইবে;"

সে সময়ে কাশীতে যে সকল শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুত হ'ত, তাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন:

কিম্‌খাপ জামদানি সাড়ী একপাটা।
সাগুলা গুদড় তাস পরে ধনুকপাটা ॥
কারচোব এ সকল জরিদার হয়।
দ্বিশত পর্য্যন্ত থানে মূল্য বিনির্ণয় ॥
সাড়ি ধুতি উপর্থা রেশমীপাড়ী জরি।
পরন্তু রেশমীবাব বেসমকিনারী ॥
অপর লিখিব গোলবদন মস্রু।
হরেক প্রকার বাব ফুলাম আমারু ॥

কাশীর রমণীদের ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলি সম্বন্ধে জয়নারায়ণের বর্ণনা :

পায়ে পাঁইজোর পরে কেহ বা বাঁকরি।
হীরানামা বাঁকজোল নূপুর পঞ্চরি ॥
মকরা সকরা পরে কেহ গোলমল।
ঝমর ঝমর রবে চরণ চঞ্চল ॥
পাদাঙ্গুলে আনট বিছিয়া করে শোভা।
ঘুঙ্গুর সহিত কারু ছন্দা মনোলোভা ॥
গণ্ডারের চুড়ি কারু কনক চরিত।
ঘোরঘন মাঝে যেন তড়িত জড়িত ॥
কেহ ছন্দবন্দ দিয়া নীল চুড়ি পরে।
কনক-কিঙ্কিণী কেহ রতনে সঞ্চরে ॥
কনকের পৈছি কারু রতনে জড়িত।
রচিত অঙ্গুরী কারু দর্পণে শোভিত।
বাহুদেশে বাজুবন্দ কনকে জড়িত ॥
জরির নির্ম্মিত পরে কাঁচুলি বিহিত ॥
হীরার জড়োয়ামণি চিকা কারু গলে।
তেনরি মোহনমালা শোভে বক্ষঃস্থলে ॥

সমালোচকের মন্তব্য পুনরুদ্ধার করে বলা যায়, 'কাশী পরিক্রমা' বাঙ্গালীর গৌরবের ও আদরের সামগ্রী। ইহাতে কাব্যসৌন্দর্য, রচনা পারিপাট্য অথবা ভাষার তেমন ওজস্বিতা নাই বটে; বলিতে কি, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেকেই গ্রন্থরচয়িতাকে শ্রেষ্ঠ কবি বা শ্রেষ্ঠ লেখকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন কিনা সন্দেহ! কিন্তু তথাপি এই গ্রন্থে এমন জিনিষ আছে, যাহা প্রাচীন বাঙ্গালায় নিতান্ত বিরল।'[৩]

ইংরিজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবপুষ্ট বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ জয়নারায়ণ ঘোষালকৃত 'করুণানিধান বিলাস' (১৮১৩-১৮১৪)। বর্তমানে সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থটি স্থান পেলেও আজ থেকে প্রায় দেড় শতাব্দী পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে রচিত এই কাব্যখানি নানা কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমসাময়িক বাংলাদেশের সমাজচিত্রের প্রামাণিক নিদর্শন হিসাবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বাদ দিলেও, ইংরিজী শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি জীবনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে যে এক নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন সূচিত হল, তার পরিচয়টিও বিধৃত রয়েছে এই কাব্যে। উল্লেখযোগ্য, মধ্যযুগীয় সংস্কার, গতানুগতিকতা এবং সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করে আধুনিকতার ক্ষেত্রে উত্তরণের প্রথম সাহিত্যিক প্রয়াস 'করুণানিধান বিলাস' উনবিংশ শতাব্দীর মহান প্রতিভূ রামমোহনের 'বেদান্তসার' (১৮১৫) গ্রন্থটিরও পূর্ববর্তী।

কবি কাব্যের প্রারম্ভে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেছেন:

প্রথম বয়স মম বিষয়েতে গেল।
মধ্যম বয়স শেষ রোগেতে ভোগিল॥

৩। মুখবন্ধ; নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'কাশী পরিক্রমা'; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত।

পঞ্চাশ বিগত পরে জরায় ঘেরিল ।
মরণের ভয় আসি অন্তরে পশিল ॥
চিন্তামণি কোথা পাব এই আশা করি ।
কাশীমধ্যে দেবালয়ে কিছুকাল ফিরি ॥
কৃষ্ণরূপ মনে কিছু আদর করিল ।
ইতিমধ্যে কৃষ্ণলীলা নয়নে হেরিল ॥
দেখিতে দেখিতে লীলা হইল উদয় ।
সেইমত রচিবারে হইল নিশ্চয় ॥

অর্থাৎ জরাজীর্ণ কবি যখন মৃত্যুভয়ে ভীত, সেই সময়ে তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি থেকেই কাব্যটির সৃষ্টি। ১২২০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কবি তাঁর কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ১২২১ সালের মধ্যেই এই সুবৃহৎ কাব্যটির রচনাকার্য সমাপ্ত করেন। কবি তাঁর এই বিশাল গ্রন্থে গোকুল-বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ বৎসরের লীলা-মাহাত্ম্য কাহিনী যথার্থ ভক্তিবিনম্র চিত্তে বর্ণনা করেছেন।

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাগণ প্রত্যেকেই দেবতার নির্দেশে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন লক্ষ্য করা যায়। 'বিলাসে'র কবিও দেবতার নির্দেশেই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন—

একচল্লিশ লীলার নীত নবগান ।
এক মাসে পূর্ণ কৈল করুণানিধান ॥
স্বপনে পাইয়া আজ্ঞা জয়নারায়ণ ।
সহায় মঙ্গলদাস বৈষ্ণব সুজন ।

উল্লেখযোগ্য, কবি আধ্যাত্মিক কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েও কাব্যের আদ্যন্ত সহিষ্ণুতা এবং উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যের কোনস্থলেই কবি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অযথা ক্ষোভ প্রকাশ অথবা কটূক্তি বর্ষণ করেন নি। এমন কি কবি স্বয়ং বৈষ্ণব ধর্ম ও

আদর্শে আন্তরিক বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও অন্য দেব-দেবীর উদ্দেশে অশ্রদ্ধা কিংবা তাচ্ছিল্য প্রকাশের পরিবর্তে সকল ধর্ম ও দেব-দেবীর প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করেছেন। কাব্যের মঙ্গলাচরণেই দেবাদিদেব মহাদেব, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, দেবী ভগবতী, সূর্য, গণেশ প্রমুখ দেবদেবীদের উদ্দেশে কবিকে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে দেখা গেছে। সকল প্রকার ধর্ম ও দেবতার প্রতি কবি তাঁর অন্তরের ভক্তি ও বিশ্বাসকে রূপ দিয়ে বলেছেন :

যবনে রাখিল নাম মাহাম্মদ বাণী।
চীন দেশে ফোই বলে গুরুকে বাখানি ॥
নানা দেশে নানা নাম গুরু একনাথ।
ত্রাণের কারণ গুরু বিশ্বে বিশ্বনাথ ॥
গোরও দেশেতে গুরু বহু নাম ধরে।
বিশেষ করিল কীর্তি যাই বলিহারি ॥
ক্রাইষ্ট বলিয়া তথা সদা করি গান।
গুরু মোর সর্ব্ব দেশে করিবেন ত্রাণ ॥

এমন কি কবি স্বয়ং বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হয়েও কাব্যের একাধিক স্থলেই কৃষ্ণ ও কালীকে অভিন্ন রূপে বর্ণনা করেছেন :

মহাকালী ইষ্ট দেবী গোপকুলে জানি।
শ্রীকৃষ্ণ হইল কালী গোপিনী যোগিনী ॥

কারণ কবি জানেন, রূপে ভিন্ন হলেও স্বরূপে উভয়েই এক—

কালী কৃষ্ণতন্ত্রে মন্ত্রে নাহি কিছু ভেদ।
চতুর পণ্ডিত জানে যুক্ত তত্ত্ব বেদ ॥

অথচ উল্লেখযোগ্য 'বিলাসে'র কবি যে মনে-প্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন, তার পরিচয় কাব্যের বহুস্থানেই প্রকাশিত :

কৃষ্ণ বিনা যেন না কহে রসনা।
মম তনু তরি তুমি হে কাণ্ডারী তুফানে বাঁচাইয়া রাখনা ॥

'বিলাসে'র রচয়িতা যে যথার্থ কবিদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন, তার পরিচয়ও কাব্যের নানা স্থানেই প্রকাশিত। এই প্রসঙ্গে কাব্যে প্রযুক্ত কয়েকটি অলঙ্কারের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলি গতানুগতিকতার পরিবর্তে নূতনত্বের আস্বাদ দান ক'রে থাকে। দুগ্ধদোহন শিক্ষাকালে কৃষ্ণের কালো অঙ্গে পতিত দুগ্ধের বিন্দুগুলির শোভা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন :

দুগ্ধ ছিটা কৃষ্ণ অঙ্গে সুন্দর শোভিল।
নীলাকাশে তারা যেন উদয় হইল ॥

গোপীগণের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন :

গোপিকা আনন শোভা দেখি ব্রজরায়।
রূপ বনে যেন বিধি কমল ফুটায় ॥

কৃষ্ণের আঁখি বর্ণনায় কবি নিজের অসামর্থ্যের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

যুগল লোচন চঞ্চল খঞ্জন কবি কেমনে বর্ণায়।

—অর্থাৎ অস্থির খঞ্জনের অনুরূপ শ্রীকৃষ্ণের সদাচঞ্চল যে আঁখি, তা বর্ণনার অতীত।

দোলখেলায় রঙের দ্বারা আচ্ছন্ন কৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গের বর্ণনায় কবি যথার্থ সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন :

কালিন্দীতে জবাফুল ফিরিছে ভাসিয়া।
হেন শোভা কৃষ্ণ অঙ্গে দেখরে চাহিয়া ॥
কালী অঙ্গে রক্তছটা অসুর বধিয়া।
সেই শোভা কৃষ্ণ অঙ্গে বিরহ নাশিয়া ॥

এখানে উল্লেখযোগ্য, কবি কেবলমাত্র শক্তিপূজার ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপকরণ জবা পুষ্পেরই যে উল্লেখ করেছেন তাই নয়, সেইসঙ্গে অসুরদলনী শ্যামার সঙ্গে কৃষ্ণকে উপমিত করেছেন।

অত্যন্ত সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর বর্ণনার মাধ্যমে গভীর

ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ করে কবি জয়নারায়ণ স্বভাব-কবিত্বেরও পরিচয় দিয়েছেন :

অলকা তিলক রাই দেয় নিজ হাতে।
আপনি সাজায় রাই আপনা ভুলাতে ॥

'বিলাসে'র কবির শালীনতাবোধও তাঁর কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাস্তবিক, কাব্যের আদ্যন্ত কবি যে পরিচ্ছন্ন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা যথার্থই প্রশংসার যোগ্য। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং অপরাপর নানা বৈষ্ণব কাব্যগ্রন্থের নানা অংশই সুস্থরুচির-পরিপন্থী বলে প্রতিভাত হয়ে থাকে। কিন্তু 'বিলাসে'র কবি কাব্যের সর্বত্রই যথার্থ মাত্রাজ্ঞান ও সুস্থ রুচিবোধের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। রাধা-কৃষ্ণের সম্ভোগ বর্ণনার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করেছেন কবি :

চলিতে পথেতে বৃষ্টি হইতে লাগিল।
সুচারু কুঞ্জের মধ্যে দোঁহে প্রবেশিল ॥
বাহিরে মেঘের ধারা পড়ে অবিশ্রাম।
কুঞ্জেতে প্রেমের বৃষ্টি মন অভিরাম ॥

অন্য কোন কবি এর পরবর্তী-অংশে হয়ত স্থূল সম্ভোগ বর্ণনার চূড়ান্তে উপনীত হতেন। কিন্তু 'বিলাসে'র কবিকে এধরণের বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতে দেখা গেছে। যেখানে সম্ভোগ লীলার বর্ণনা করেছেন কবি, সেখানেও তিনি পরোক্ষ বর্ণনার সহায়তা নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, শয়ন সম্ভোগ লীলার বর্ণনা উল্লেখ্য :

ভ্রমরা ভ্রমরী দুই রূপ ধরি রতি মতি সহতায়।
কত ভঙ্গী করি দলে দলে ফিরি মধু খায় আর গায় ॥
চুম্বকে চুম্বিত আয়সে যে মত মিলিত তেমত জান।
নীরে মীন পশি হইল উল্লাসী তেমত আনন্দ মান ॥

নব মেঘে পশি কনকের শশী বরিষয়ে সুধারাশি।
বসন চপলা হইল বিকলা অরুণ রহিল হাসি ॥
কটক শিখরে নব মেঘে ঘেরে ঢাকিল সোনার গিরি।
চাঁদ চন্দ্রিকায় কলঙ্ক লুকায় ভানু ঢাকে বিভাবরী ॥

কাব্যের নানাস্থানে প্রবাদের প্রাচুর্য 'করুণানিধান বিলাসে'র এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং কবির তীক্ষ্ণ বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচায়ক: বাঞ্ছিতে বঞ্চিত কভু যশ নাহি পায়; চোরে চোর দেখে সবে চোরের স্বভাব; যার সঙ্গে যার লাগ সেই জানে মর্ম, পুরাণ প্রমাণ নহে রচনা প্রমাণ, এক বিন্দু দানে সিন্ধু কভু না শুকায়, মুর্খ কবে ধীর বলহীন বীর দীন কবে ধনবান, যত জাতি তত রীতি অক্ষর বচন, বুদ্ধিমন্ত বলবান্ যদি বুদ্ধিহারা হন বলগুণে স্বগুণ বাড়ায়, অজ্ঞান গুণেতে বান্ধি বান্ধা নাহি যায়, অজ্ঞানে না জানে তত্ত্ব জানে জ্ঞানবান, যে বস্তু যে জনে খায় উদ্‌গারে উদ্দেশ পায়—প্রভৃতি প্রবাদগুলিই তার প্রমাণ।

জয়নারায়ণ যে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন কাব্যের নানাস্থানেই সে পরিচয় বিদ্যমান। কবি বলেছেন: 'কর্তা এক গুরু এক ভক্তজন অনেক কিন্তু ভাব এক'। অন্যত্র বলেছেন:

কর্তাকে বিশ্বাস কভু হয় আশ
পুন ভুলি তাহা ভ্রমে মরি।

কিংবা,

একই মালিক নিত্য নিশ্চয় জানিবা।
কর্তা ভিন্ন অন্য দেবে কভু না ভজিবা ॥

'রোগীর স্তুতি' অংশে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতি কবির গভীর অনুরাগ বিশেষভাবে পরিস্ফুট:

হে কর্তা পরম বন্ধো দুঃখে কর ত্রাণ।
তব পদ ভুলি এবে ব্যাধির ভোগন ॥

অপরাধ মত্ত শাস্তি হইল উচিত।
তোমার স্মরণ জন্য মানিল বিহিত॥
তুমি বিনা আর নাহি উদ্ধারিতে মোরে।
ব্যাধির ব্যথায় মন ফেলে দূরে জোরে॥
অন্তিম সময়ে প্রভু ভুলিলে তোমায়।
পুন আর জুড়াইতে নাহিক উপায়॥
ত্রাহি ত্রাহি মহাকর্তা দেহিমে আশ্রয়।
জীর্ণ পাপ দূর করি ওপদ সহায়॥

কবি বিনয় প্রকাশ করে কাব্যের একস্থানে বলেছেন ঃ

আশা বড় বিদ্যা নাহি কবিতা জুড়িতে।
কেবল লীলার জন্যে কহি বুদ্ধিমতে॥

কিন্তু 'করুণানিধান বিলাসে'র স্থানে স্থানেই কবির অপূর্ব ছন্দোনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এর অনেক ক্ষেত্রেই জয়দেব ও গোবিন্দদাসের প্রভাব অতিশয় প্রকট ঃ

বনমোহন সঘন রমণ কুঞ্জভবন মন্দ পবন বিবিধ বিরব সরস রভস
অতুল মুদিত অঙ্গ।
বিমল মহল বিতুল সকল পর পরিকর নিকর চতুর রমণী রমণ রমণ
রমণী ভূষণ ভরভঙ্গ॥
অরুণ চরণ রমণ ভরণ সমন দমন সুঘন চলন করভ করহি ধুনন নটন
ভ্রমণ ভ্রুকুটি সঙ্গ।
গগন সুঘন সঘন বিরব করণ মসৃণ বিরণ বিতনু সুতনু উদিত মুদিত
রণিত নূপুরমৃদঙ্গ॥

জয়নারায়ণ তাঁর কাব্যের উপকরণ শ্রুতি, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা, মহাভারত, পদ্ম পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালী পুরাণ, সংমোহন তন্ত্র, গৌতমীয় তন্ত্র,

শুক্র পুরাণ, বশিষ্ঠ পুরাণ, মহেশ পুরাণ, পরাশর পুরাণ, ভার্গব পুরাণ প্রভৃতি থেকে যেমন সংগ্রহ করেছেন, তেমনই কাব্যে কবির স্বকপোল কল্পিত আখ্যানের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। প্রসঙ্গতঃ কৃষ্ণের ফলহারী লীলা, পতঙ্গলীলা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া লীলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'ফলহারী লীলা'য় কবি বালক কৃষ্ণ কর্তৃক এক দুঃখিনী অথচ ভক্তিমতী ফল বিক্রেতার প্রতি করুণা প্রদর্শনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বৃন্দাবন থেকে আগত ফল বিক্রেতার সকল ফল অপরাপর বালকসহ কৃষ্ণভক্ষণ করলেন, তারপর তাকে ফলের মূল্য হিসাবে—

কোঁছড় পুরিয়া ধান গোলা কাট্যা আনে।
কুজুড়ানি দাম লও ফলের কারণে ॥
আঁচল পাতিয়া লয় আদর সম্মানে।
আঁচলে পড়িতে সোনা হয় ততক্ষণে ॥

'পতঙ্গলীলা'য় রাখাল বালকগণ সহ কৃষ্ণের ঘুড়ি ওড়ানোর মনোজ্ঞ বিবরণ বাস্তবিক যেমন বাস্তব, তেমনই জীবন্ত হয়ে উঠেছে ঃ

আইল বসন্ত ঋতু পবন মলয়।
রাখাল মিলিয়া যুক্তি কৈল যদুরায় ॥
উড়াইব সবে মিলি আকাশে পতঙ্গ।
দেখিবেক ব্রজবাসী আমাদের রঙ্গ ॥
কার্পাস রেশম সুতে পাকাইয়া ডুরি।
শ্বেত পীত কাল লাল বহু রঙ্গ করি ॥
সীসা চুরমাড় মাখি ডিম্বলসি দিয়া।
মাঞ্জা বানাইল বহু ছায়াতে মাজিয়া ॥
কনকের কানকার্য রাখিল জড়াই।
পিলিণ্ডি করিয়া ডুরি তাহাতে লাগাই ॥

কেহ কেহ নখ সাজি জড়ায়্যা নাটাই।
পরটি ঘুরায় হাতে করি চতুরাই ॥
বৃন্দাবন রজ দিয়া মাঞ্জা বিরচিল।
একত্র মিলিয়া শিশু ব্রজে উড়াইল ॥

* * *

তেলাঙ্গা চৌকোন ঘুড়ি উড়ে বহু ভাঁতি।
যমুনার তীরে স্থান সুন্দর সঙ্গতি ॥

* * *

সয় সয় পেঁচ দিয়া সুরকি চালায়।
কভু লাট কভু ঘাট কভু গোত্তা দেয় ॥
পতঙ্গে পতঙ্গ কাটে ডুরি লোটে তায়।
সকল শিশুর ঘুড়ি কাটে ব্রজরায় ॥

শুধু কি তাই, শেষে কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গেও 'পতঙ্গ' খেলায় অংশ-গ্রহণ করলেন ঃ

রাধার পতঙ্গে চন্দ্র নিশানি করিল।
কৃষ্ণের পতঙ্গে চিহ্ন মুকুট রচিল ॥

শেষে,

পেঁচাপেঁচি পতঙ্গেতে সুরকি চলিল।
কৃষ্ণের পতঙ্গখানি মায়াতে কাটিল ॥

'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' লীলায় সুভদ্রা কর্তৃক কৃষ্ণ, বলরাম এবং অপরাপর সখাগণকে তিলকদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। কবির বর্ণনার গুণে কৃষ্ণ, বলরাম এবং সুভদ্রার মাধ্যমে বাংলা দেশের ভাই-বোনের মধুর সম্পর্কটি পরিস্ফুট হয়েছে ঃ

যদ্যপি সময় নহে ব্রজেতে যাইতে।
তথাচ আইলা ভদ্রা ভাইকে তুষিতে ॥

* * *

কুলাচার মত কৃষ্ণ ভগিনী পূজিল।
চন্দন তিলক ভালে অঙ্গুলিতে দিল ॥
বসন ভূষণ ভোজ গণ্ডূষ সহিত।
স্বর্ণ পীঠে বসাইয়া দিল পঞ্চামৃত ॥
এই মত বলরামে আর সখাগণে।
তুষিল তিলক দিয়া বসন ভূষণে ॥

'করুণানিধান বিলাস' কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আয়ান ঘোষের অনুপস্থিতি। কবি যে শুধুমাত্র আয়ান সম্বন্ধেই নীরব থেকেছেন তাই নয়, সেইসঙ্গে জটিলা—কুটিলা প্রসঙ্গকেও সীমিত পরিসরে বর্ণনা করেছেন ঃ

মঞ্জু ঘোষ সুতা সেই গোপকুলে কাঁটা।
মুখেতে সতীর ভাব ব্যভার কুলটা ॥
আয়ান ঘোষের ভগ্নী নামতো কুটিলা।
কুটিল হৃদয় তার জননী জটিলা ॥
আকৃতি প্রকৃতি মত স্বজাতীয় নাম।
দুঃশীল তাহার রীত মন্দ গুণ গ্রাম ॥
শ্যাম কলঙ্কিনী রাধা ব্রজেতে রটায়।
অঘটনা মন্দ কার্য্য তখনি ঘটায় ॥

শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের অসুখ উপলক্ষে শ্রীমধুমঙ্গলের দৈবজ্ঞ বেশে জটিলা-কুটিলার সতীত্বের পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে জটিলা-কুটিলার প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন, 'কবি তাঁর কাব্যে জটিলা-কুটিলাকেও বাদ দিয়েছেন'।[৪] কিন্তু বাস্তবতঃ কবি স্বল্প পরিসরে জটিলা-কুটিলার

৪। শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী রচিত 'রাজকবি জয়নারায়ণ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ; সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ; ৭ম ভাগ ; ১ম সংখ্যা—পৃষ্ঠা ১—২৫।

চরিত্রাঙ্কণ এবং প্রসঙ্গ বর্ণনা করলেও, কাব্য মধ্যে এদের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বাঙালীর সংসার ও সমাজ জীবনের নিখুঁত চিত্র হিসাবে 'করুণানিধান বিলাসে'র ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষ্ণলীলার বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের উৎসবানুষ্ঠানের যথাসম্ভব খুঁটিনাটি বিবরণ দান করেছেন। প্রসঙ্গতঃ কোজাগরী লীলা, মনসাপূজা লীলা, দুর্গোৎসব লীলা, কালী-পূজা লীলা, চড়কপূজা লীলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলার পল্লী অঞ্চলে এবং গঙ্গাতীরবর্তী শহরাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের গীতপদ্ধতি ও গানের রীতি যে সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল, তার প্রমাণও 'করুণানিধান বিলাসে' বর্তমান। কবি বলেছেন :

সংকীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দর,
গড়াহাটী, রানিহাটি বিরহ মাধুর।
অভিসার মীলনাদি গোষ্ঠের বিহার।
কবি পশতো তালফেরা শুনিতে মধুর॥
পাঁচালী অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর।
কথকতা তরজাতে শাড়িতে প্রচুর॥
ভবানী ভবের গান মালসী মায়ূর।
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী বিজয়াতে ভোর॥
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুরচুর।
গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর॥
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর।
শ্রবণে যাহার গান ভকত আতুর॥
কালিয়দমন রাস চণ্ডীযাত্রা ধীর।
রচিল চৈতন্যযাত্রা রসে পরিপূর॥

সাপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর।
বাঙ্গলার নবগান নূতন ঝুমুর ॥

'বিলাসে' নূতন পাঁচালী যাত্রা গানের, চরক সন্ন্যাস লীলার প্রসঙ্গে বোলান-তরজা, জারি গান, শাড়ি গান ইত্যাদির বহুল উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। জয়নারায়ণের সময়েও যে শাড়ি গান (সারি গান) একান্তভাবে পূর্ববঙ্গের নিজস্ব সম্পদ ছিল, তা কবির বর্ণনাতেই জানা যায়—

বাঙ্গাল বুলিতে শাড়ি ঝুলেতে গাইবে।
দুই পাশে দাঁড়ি মিলি সঙ্গে স্বর দিবে॥

এই প্রসঙ্গে কবি বর্ণিত একটি সারি গান উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

যমুনায় তরণি বায় বলাইমোহন।
বৈঠায় পঞ্জনি বাজে জুড়ায় শ্রবণ॥
শ্যাম রূপে আল করে কালিন্দীর কূল।
যুবতী গোপিনী হেরি হইল আকুল॥

প্রাচীনতম কবিগানের নিদর্শনও 'করুণানিধান বিলাসে' বর্তমান। সুতরাং বাংলা লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সংগ্রহ হিসাবেও 'বিলাস'কে অভিহিত করা চলে। সে সময়ে বাংলা দেশের প্রচলিত নানাবিধ নৌকার বর্ণনাও কবি দিয়েছেন :

পরিন্দা লচকা ডিঙ্গা বহু পলওয়ার।
ভাউলিয়া কাক জঙ্গি পিনিস বিস্তার॥

কেউ কেউ মনে করেন যে 'করুণানিধান বিলাসে'র রচয়িতা জয়নারায়ণ নন, একাধিক ব্যক্তির প্রয়াসেই এটি রচিত। কিন্তু কবির নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায় দেখা যায় :

একচল্লিশ লীলার নীত নবগান।
এক মাসে পূর্ণ কৈল করুণানিধান॥

স্বপনে পাইয়া আজ্ঞা জয়নারায়ণ।
সহায় মঙ্গলদাস বৈষ্ণব সুজন ॥
সংস্কৃত তাল সুরে মাধব পণ্ডিত।
ব্রজের ভাষাতে ভউ গাইল বিহিত ॥
বাঙ্গালী ভাষায় গায় ভুবনমোহন।
বুদ্ধিহীন বাণীহীন জয়নারায়ণ ॥
তবু আকিঞ্চন করে রচিতে কীর্তন।
কৃপা করি শ্রোতা ভক্ত ক্ষমহ দূষণ ॥

এর থেকে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, কাব্যটির রচয়িতা জয়নারায়ণ। কাব্যের নানাস্থানেই কবির নিজের ভণিতাও লক্ষণীয়। কখনও কবি পাঠকদের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন :

দীন জয়নারায়ণে ক্ষমা করি দোষ।
ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণকথা শুনহ পীযূষ ॥

আবার কখনও কবি বলেছেন ঃ

রচিল সকল লীলা শ্রীরাধা সুন্দরি।
জয়নারায়ণ হেরি যায় বলিহারি ॥

অথবা,

এই ছায়ামতে তরু নব বৃন্দাবনে।
রচিল ভকতদাস জয়নারায়ণে ॥

সুতরাং এ সকল দৃষ্টান্তে 'বিলাসে'র রচয়িতা হিসাবে জয়নারায়ণের দাবীই প্রতিষ্ঠিত হয় নিঃসন্দেহে।

বাংলা চলিত রীতির ক্রম-বিবর্তন

সাহিত্যের ইতিহাসে আকস্মিকতার ব্যাপারটি সম্ভবতঃ অর্থহীন। বিষয়বস্তুর কথা বাদ দিলেও, বিশেষ করে প্রকাশরীতির ক্ষেত্রে এই মন্তব্য অনস্বীকার্য। অর্থাৎ সাহিত্যের ইতিহাসে সব কিছুই ক্রম-বিবর্তনের সূত্রে বিধৃত। কিন্তু তবু নিছক কাজের সুবিধার জন্যেই ব্যক্তিবিশেষের রচনাকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কোন যুগ অথবা রীতির সূত্রপাত ধরা হয়ে থাকে মাত্র।

ভূমিতে ফসল ফলানোর পূর্বে ক্ষেত্র প্রস্তুতির প্রয়োজন অপরিহার্য। ভূমি কর্ষণ, জল সেচন, বীজ বপন, সার প্রদান, নিয়মিত তত্ত্বাবধান প্রভৃতিরই স্বাভাবিক পরিণতি শস্যের উৎপাদন। অনুরূপভাবে সাহিত্যের ইতিহাসেও ক্ষেত্র প্রস্তুতির ব্যাপারটিকে অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ, পূর্বসূরীদের প্রস্তুত ক্ষেত্রই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-বিশেষের রচনাকে চরমোৎকর্যদান করে থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সূত্রপাত সাধারণভাবে মধুসূদন থেকেই ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর পূর্বসূরী—ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল প্রমুখদের অবদানকেও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়। কিংবা যে গদ্য কবিতার সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'কে কেন্দ্র করে, সেই গদ্য কবিতার আদিপর্বের ইতিহাস কিন্তু 'লিপিকা'র বহু পূর্বেই যে 'বেদ', সংস্কৃত 'চম্পূ' কাব্য, বাণভট্টের 'কাদম্বরী', রূপকথা, ব্রতকথা, রাজকৃষ্ণ রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতিদের মাধ্যমে রচিত হয়েছিল—তা কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। আবার যে বাংলা গদ্যের 'জনক' বলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অভিহিত করা হয়ে থাকে, সেই বাংলা

গদ্যের ক্ষেত্র যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন প্রমুখদের দ্বারা প্রস্তুত হয়েছিল, তা কোনমতেই বিস্মৃত হওয়া চলে না। অনুরূপভাবে যে প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র'কে (১৯১৩) কেন্দ্র করে বাংলা চলিত রীতির জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল, মনে রাখতে হবে যে, সেই প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর 'সবুজপত্রে'র আত্মপ্রকাশের বহুপূর্বেই বাংলা চলিত রীতির প্রকাশ ঘটেছিল—অবশ্য কোন ক্ষেত্রে তা হয়ত অসচেতনভাবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খণ্ডিত ভাবে। কিন্তু তবু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পূর্ববর্তীকালের খণ্ডিতভাবে প্রকাশিত চলিত বাংলাই শেষ পর্যন্ত ক্রমবিবর্তনের ধারায় আজকে রাজকীয় আধিপত্য লাভে সমর্থ হয়েছে। এককালে যে চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাধুভাষার সমর্থকদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম করতে হয়েছিল, আজ সেই ভাষাই আমাদের ভাবপ্রকাশের একমাত্র না হলেও উল্লেখযোগ্য মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। আজকের কোন লেখক আর তেমন সাধুভাষায় গল্প অথবা উপন্যাস রচনা করেন না। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য এই চলিত রীতিরই ক্রম-বিবর্তন ধারাটি। এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য, তা হ'ল—যে রীতিটি পরবর্তীকালে রাজকীয় আধিপত্য লাভ করবে, সেই চলিত রীতি বাংলা গদ্যের সূচনা পর্ব থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পাদ্রী মানোএল দা আসসুম্প সাঁউ রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থটি যে ভাওয়ালের প্রচলিত মৌখিক ভাষায় রচিত, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা গদ্যে রচিত প্রথম গ্রন্থটিই (?) তা হ'লে বাংলা চলিত ভাষায় রচিত। গ্রন্থটি থেকে কিছু নিদর্শন গ্রহণ করা যেতে পারে—

> গুরু। অপূর্ব্ব কথা কহিলা। কিন্তু কেহ কহিবে ঃ আমি মালা জপি না; তথাচ আন ধরণ ভজনা করি; জপি খ্রিস্তর কাছে, আর

আর সিদ্ধারে ভজনা করি, এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গের যাইবার, তাহান কৃপায়। তুমি কি বল।

শিষ্য। যে আমি কহি, তাহা তুমি শোন; সকল যত ভজনা ভালো, কিন্তু বিনে ঠাকুরাণীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরাণীর ভজনা বিনে আর যত ভজনায় বাছা মুক্তি পাইবার পাপ না করিলে। এবং ঠাকুরাণীর ধ্যান সকলের অতি উত্তম মালার ধ্যান। আশ্চর্য্য বুঝাই শোন।

ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক সংবাদে'ও আমরা চলিত বাংলার নিদর্শন লক্ষ্য করতে পাই। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র ন্যায় এটিতেও খ্রীষ্ট মহিমা প্রশ্নোত্তর ছলে বর্ণিত হতে দেখা গেছে। বিষয়গত সাদৃশ্যের কথা বাদ দিলেও 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র সঙ্গে এটির ভাষাগত সাদৃশ্যও লক্ষণীয়—

ব্রাহ্মণ। তুমি কারে ভজো?

রোম। পরমেশ (শ্ব) রেরে পূর্ণো ব্রমে (হ্ম) রে।

ব্র। তবে তোমোরা বরো উত (ত্ত) ম ভজোনা ভজো, আমোরা তাহারে ভজি (?)।

রো। যদি তোমোরা সেই পূর্ণো ব্রমে (হ্ম) রে ভজো তবে কেনো এতো কুবিত কুর্বরাণ নানা অধর্ম্মো ভজোনা দেখি?

ব্র। তুমি এমত গিয়া (ন) মোস্তো হইয়া আমারদিগের পরমেশ (শ্ব) রেরে নিন্দা করহ? এহাতে তোমারদিগের শাস্ত্রে অপারনিমান নাহি?

রো। আমারগোর শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে জন ধর্ম্মো নিন্দা করে, সে বড়ো নারোকী এবং যে জন অধর্ম্মেরে ধর্ম্মো বলে সে মহা নারোকী।

মনে রাখতে হবে বিদেশীদের দ্বারা যে বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হয়েছিল, তার পেছনে ছিল তাদের নিজেদেরই স্বার্থ। পোর্তুগীজ পাদ্রীরা যে চলিত বাংলায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাও বিনা কারণে নয়। পাদ্রীরা প্রথম থেকেই জনসমাজে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যেই চলিত ভাষায় গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

করেছিলেন। যাই হোক কেবলমাত্র বাংলা গদ্যের আদিযুগের নিদর্শন হিসাবেই নয়, বাংলা চলিত রীতির ধারায় আঞ্চলিক কথ্য-ভাষায় রচিত এ গ্রন্থ দু'টির যে বিশেষ মূল্য আছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের রেভাঃ উইলিয়াম কেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর কারণ, কেরী যে কেবলমাত্র পণ্ডিত-মুন্‌শীদেরই বাংলাগ্রন্থ রচনায় বিশেষ উৎসাহ দান করেছিলেন তাই নয়, নিজেও একাধিক গদ্যগ্রন্থ রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি একদিকে বাংলা গদ্যকে আরবী-ফারসীর প্রভাব থেকে মুক্ত করে এবং সংস্কৃত আদর্শের অনুগামী করে তার গঠন-সৌষ্ঠব এবং প্রকাশ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আবার অপর দিকে কথ্যভাষাকে একটা সম্মানিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে বিশেষ সহায়তা করেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর Dialogues Colloquies বা 'কথোপকথন' গ্রন্থখানির উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রন্থটি তৎকালীন সিভিলিয়ানদের চলিত বাংলা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল।

বাস্তবিক, একাধিক কারণেই 'কথোপকথন' গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে যুগে মৌখিক ভাষা শিক্ষায় এই গ্রন্থটির যে বিশেষ অবদান ছিল তা সহজেই অনুমান করা চলে। ইতিপূর্বে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ঠিক ৫৮ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থেও আমরা ভাওয়ালের প্রাদেশিক মৌখিক ভাষার সর্বপ্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করি। কিংবা 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদে'ও প্রায় 'কৃপার শাস্ত্রের'ই অনুরূপ ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উভয় গ্রন্থের ক্ষেত্রেই যে বিষয়বস্তুগত সীমাবদ্ধতা ছিল, তা অস্বীকার করা চলে না। বলা বাহুল্য এ দু'টি গ্রন্থের শব্দকোষও ছিল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু কেরীর 'কথোপকথন' এদিক দিয়ে অনেকখানি

অগ্রসর হয়েছিল। বিষয়বস্তুর ব্যাপারেও 'কথোপকথনে'র বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে হয়। কারণ, কলকাতা-শ্রীরামপুর অঞ্চলের সকল শ্রেণীর মানুষের সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এ গ্রন্থে রূপায়িত হতে দেখা গেছে। চাকর ভাড়া করা, ভোজনের কথা, মজুরের কথাবার্তা, স্ত্রীলোকের কথা, মেয়েদের ঝগড়া, ঘটকালি, পণ, বিবাহরাত্রের খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এতে স্থান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, কেরীর 'কথোপ-কথনে'র ভাষাই পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিক চলিত ভাষায় পরিণত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। কয়েকটা দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

(ক) ……চল দিকি যাই না গেলে তো হবে না ঘরে বেসাতি পাতি কিছু নাই ছেলেরা ভাত খাবে কি দিয়া আর আধসের টাইক কাপাইস আনিতে হবে।

ওগো দিদি সূতা আছে। বাহির কর দিকি দেখি। নারে তোরে আর সূতা দিব না আর দিন তুই যে সূতা হাঁটকিয়াছিলি তাহাতে আমার সূতা নষ্ট হইয়াছে।

(স্ত্রীলোকের হাটকরা)

(খ) ……তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিন কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার প্লুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস।

……তখন তোমার কোন বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি রাত্রে মরে। ও যে কালি প্রাতঃকালে বাছা বাছা করে কান্দে তবেই ও অহ্কারির অহ্কারে ছাই পড়ে।

(কন্দল)

(গ) আসোগো ঠাকুরঝি নাতে যাই।

ওগো দিদি কালি তোরা কি রেন্ধেছিলি।

আমরা মাচ আর কলাইর ডাইল আর বাগুন ছেঁচকি করেছিলাম।

তোরদের কি হইয়াছিল।

আমাদের জামাই কালি আসিয়াছে রাসমুনিকে নিতে। তাইতে শাকের ঘন্ট সুক্তনি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলশা মাচের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলার অম্ল হইয়াছিল।

(স্ত্রীলোকের কথোপকথন)

কেরীর পূর্ববর্তীকালে রচিত চলিত বাংলার যে নিদর্শন পূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাদের তুলনায় 'কথোপকথনে'র বাংলা যে কত জীবন্ত, সহজ ও স্বাভাবিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সামান্য কিছু পরিবর্তন-সাপেক্ষে আধুনিক চলিত বাংলার সঙ্গে এ ভাষার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। সমালোচক যথার্থই বলেছেন "......তিয়রিয়া কথা, ভিক্ষুকের কথা, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাটকরা, মজুরের কথাবার্তা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন প্রভৃতি অধ্যায় এমনই সহজ এবং বাস্তব ভঙ্গিতে রচিত যে, এগুলির কথা বিবেচনা করিলে টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম ও দীনবন্ধু মিত্রের পরবর্তীকালের কৃতিত্ব অনেকখানি লঘু হইয়া পড়ে।" কিন্তু এ হেন 'কথোপকথনে'র রচয়িতা হিসাবে সকল সম্মান কেরীরই প্রাপ্য কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখেছেন—

"That the work might be as complete as possible, I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural style of the persons supposed to be speakers."

—সুতরাং কেরীর কথামত গ্রন্থের রচয়িতা যে একাধিক ব্যক্তি তা দেখা গেল। অবশ্য অনেকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনার সঙ্গে বিশেষতঃ তাঁর 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষার সঙ্গে 'কথোপকথনে'র যথেষ্ট

সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এই গ্রন্থের রচয়িতা রূপে বিদ্যালঙ্কারেরই উল্লেখ করে থাকেন। সে যাই হোক, মোটের ওপর রচয়িতা অপেক্ষা 'কথোপকথনে'র পরিকল্পনা তথা সম্পাদনার কৃতিত্বই বিশেষভাবে কেরীর ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

এইবার আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের প্রসঙ্গে আসতে পারি। সাধারণভাবে সংস্কৃতজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, তাঁর গদ্য নাকি জটিল এবং সংস্কৃতানুসারী। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে এরূপ সমালোচনা নিঃসন্দেহে আংশিকতা দোষে দুষ্ট। কারণ মৃত্যুঞ্জয় যদিও এক শ্রেণীর গ্রন্থে সংস্কৃত বাক্‌রীতির ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন, কিন্তু তাই বলে কেবলমাত্র এই শ্রেণীর রচনাকে কেন্দ্র করে মৃত্যুঞ্জয়ের সামগ্রিক রচনা সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য করলে লেখকের প্রতি অবিচার করা হবে। মৃত্যুঞ্জয়ের সংস্কৃতানুসারী রচনারীতির সঙ্গে সঙ্গে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র (১৮৩৩) কিছু কিছু অংশকেও স্মরণ করতে হবে, যেখানে তিনি চলিত বাংলার স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে অসামান্য সাফল্য লাভ করেছেন। এমন কি নিতান্ত গ্রাম্যভাষা প্রয়োগেও তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হন নি।

—কার্পাস তুলি তূলা করি ফুড়ী পিঁজী পাঁইজ করি চরকাতে সূতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়া ফুলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশগণ্ডা যা পাই। ও মিন্‌সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুন করি কাটনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেণ আমানি খাই।

বিশেষতঃ

শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই সেদিন তো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠ্‌করিয়া খায় তেল বিহনে মাতায় খড়ি উড়ে।

—এরূপ অংশ যেন আজকের দিনের রচনা বলে ভ্রম হয়।

বাস্তবিক, মৃত্যুঞ্জয়ের যে চলিত রীতির প্রতিই স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল 'প্রবোধচন্দ্রিকা' তারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসনে'ও (১৮০২) সংস্কৃতানুসারী ভাষা রীতির সঙ্গে চলিত রীতি অনুসরণের প্রমাণ পাওয়া যায়।

রক্তমাংস মলমূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানীজনের উপযুক্ত নয়।

বাংলা গদ্যের জনকরূপে আমরা পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ করে থাকি। বিশেষতঃ আজকের সাধু-ভাষা যে বিশেষভাবে বিদ্যাসাগরেরই দানপুষ্ট, তা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন—।"

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, বিদ্যাসাগর মূলতঃ সাধুভাষায় তাঁর গ্রন্থাদি রচনা করলেও চলিত ভাষায় রচনা করারও তাঁর ছিল অসাধারণ ক্ষমতা। কিন্তু সম্ভবতঃ যেহেতু বিদ্যাসাগরের সময়ে চলিত বাংলা রীতির প্রচলন ছিল না, সেইহেতু তিনি চলিত বাংলা রীতির প্রয়োগে তেমন উৎসাহ বোধ করেন নি! "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য"—এই ছদ্মনামে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "আবার অতি অল্প হইল" পুস্তিকা থেকে বিদ্যাসাগরের রচিত চলিত বাংলার অপূর্ব নিদর্শন গ্রহণ করা যেতে পারে—

প্রথম—ইতিপূর্ব্বে পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে, বড় জাঁকের একটা শ্রাদ্ধ হয়েছিল। খুড় আমার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়—শ্রাদ্ধের দিনে, ঐ রাজবাড়ীতে, খুড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে সন্দেশের সরা বিলতে গেলেন; এবং এক ব্রাহ্মণের হাতে একখানা সরা দিয়া, সে

বেটা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নয় জানিতে পারিয়া, তার হাত থেকে সরাখান কেড়ে নিলেন ;···সকলে বলুন পরের বাড়ীতে, বৈশাখ মাসে, কর্ম্মের দিনে, নিমন্ত্রিত শত শত ভদ্রলোকের সমক্ষে, তুচ্ছ বিষয়ের জন্যে, ব্রাহ্মণকে প্রহার করা, গুণমণি খুড়র পক্ষে উচিত কর্ম্ম হয়েছে কি না ; এবং আমি, তাঁর উপযুক্ত ভাইপো হয়ে, এমন স্থলে, চুপ করে না থেকে, উপদেশ অর্থাৎ গালি দিলে, দোষের কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত কিনা।

—এ গদ্য একেবারে হাল-আমলের বলে ভুল হবার সম্ভাবনা।

রামনারায়ণ তর্করত্ন নাট্যকার ও প্রহসনকাররূপেই মুখ্যতঃ পরিচিত। কিন্তু বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও তাঁর যে একটা সুনির্দিষ্ট স্থান আছে, তা অস্বীকার করা চলে না। বিশেষতঃ স্ত্রীচরিত্র এবং নিম্নশ্রেণীর পুরুষ চরিত্রে রামনারায়ণের ব্যবহৃত ভাষা ইতিপূর্বে অপর কোন নাট্যকারের রচনায় লক্ষিত হয় না। রামনারায়ণ ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু সেইসঙ্গে বাংলা কথ্যভাষার শক্তি সম্বন্ধে পরিচয় লাভের-কৃতিত্বও তাঁর যে প্রাপ্য, 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকই তার প্রমাণ।

যশোদা। নাতনি! আর বলিস্ নে,—বলিস্ নে, বুক ফেটে যায়! (সজল নয়নে) হাঁরে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি? কে তোকে কুলের ছিষ্টি কত্যে বলেছিল? কুল ত নয়, এ কুলের আঁটি-বড় কঠিন। যার কুল আছে, তার কি দয়া নেই? ধম্ম নেই, কম্ম নেই? আহা! আহা! কি দুঃখু! কি দুঃখু, নাতনি! তুই আর কাঁদিস্ নে। যা মেয়েদ্দের সঙ্গে যা, আবার আস্‌বে, ভাবনা কি? রাগ করে গেচে, কি কর্ব্বি? এবার এই অবদি কাটনাটা মাটনাটা কেটে কিছু হাতে করে রাখ—। তবু কাঁদ্দে লাগ্‌লি? আহা ছেলে মানুষ! বোন্! কি কর্ব্বি তা বল? এই দেক্ দেখি, আমরা কি কচ্চি। তোত্তো আছে, আমার যে নেই তা কি কর্ব্বো!

সমালোচকের ভাষায় বলা যায়, "বিভিন্ন প্রকৃতির বাংলা কথ্য-ভাষা লইয়া রামনারায়ণ তাঁহার রচিত সাহিত্যের মধ্যে যে পরীক্ষা-মূলক কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই যে তাঁহার

পরবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে কথ্যভাষায় সাহিত্য রচনার ব্যাপক প্রয়াস দেখা দিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

"আলালী ও হুতোমের ভাষার ভিত্তি সন্ধান করিতে গেলে রামনারায়ণে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে।"[১]

বাংলা চলিত ভাষার বিবর্তনে 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মনামের অন্তরালে অবস্থিত প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্যারীচাঁদ যে সময়ে বাংলা গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন, সে সময়ে বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্তের আধিপত্য। বলা বাহুল্য এঁদের সংস্কৃতানুসারী গদ্য সর্বসাধারণের বোধগম্য ছিল না। কেবল মাত্র শিক্ষিত জনেরই বোধগম্য ছিল। এইজন্যেও বটে, তা ছাড়াও যে চলিত বাংলা তখনও পর্যন্ত সাহিত্যিক মর্যাদা লাভে অসমর্থ ছিল, তাকে সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে প্যারীচাঁদের প্রয়াস যুক্ত হ'ল। বিশেষভাবে কথ্য ইংরিজীর সাহিত্যিক মর্যাদা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল চলিত বাংলায় সাহিত্য রচনায় এবং তাকে যথাযোগ্য সম্মান দানে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ, রাধানাথ শিকদারের সহায়তায় সম্পূর্ণ চলিত ভাষায় 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তিনি যথাসম্ভব কলকাতার কথ্য ভাষার ব্যবহার করতে লাগলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা সম্পূর্ণ চলিত বাংলা নয়। কারণ এতে সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার করা হয়েছে। তবে চলিত শব্দ-ইডিয়ম প্রভৃতির বহুল ব্যবহারের ফলে ভাষা অনেকাংশে চলিত বাংলার নিকটবর্তী হতে পেরেছে।

---

১. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ; পৃষ্ঠা-৯২

সকলে বলিল—মহাশয় যান কোথায়? কবিরাজ কহিলেন—উল্বণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে বোধহয়, এক্ষণে রোগীকে এস্থানে রাখা আর কর্ত্তব্য নহে—যাহাতে তাহার পরকাল ভাল হয় এমত চেষ্টা করা উচিত। রোগী এই কথা শুনিয়া ধড়মড়িয়া উঠিল—কবিরাজ এই দেখিয়া চোঁ করিয়া পিট্রান দিলেন—বৈদ্যবাটীর অবতারেরা সকলেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ে যাইতে লাগিল —কবিরাজ কিছুদূর যাইয়া হতভোম্বা হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন—নববাবুরা কবিরাজকে গলাধাক্কা দিয়া ফেলিয়া ঘাড়ে করিয়া লইয়া হরিবোল শব্দ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে আসিল।

—এখানে 'ধড়মড়িয়া', 'চোঁ করিয়া', 'পিট্রান', 'হতভোম্বা', 'গলাধাক্কা' প্রভৃতি নামধাতু ও শব্দগুলির প্রয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্যারীচাঁদের রচনার অন্য অংশ থেকেও নিদর্শন গ্রহণ করা যেতে পারে, যেখানে ভাষা অত্যন্ত লঘু এবং জীবন্ত হয়ে চলিত ভাষার ঘনিষ্ঠ নিকটবর্তী হতে পেরেছে—

দেপাক-দেপাক—ডেডাং ডেডাং ডেং ডেং। চড়ুকের পিট চড় চড় করে তবুও পাদুটি নেড়ে আঙ্গুল ঘুরায়ে এক এক বার বলে, দে পাক—দে পাক। মাতালও সেইরূপ—গলগলি মদ খেয়ে চুরচুরে হয়েছে—শরীর টলমল করছে —কথা এড়িয়ে গেছে—ঝুঁকে ২ এদিক ওদিক পড়্ছে, তবু বলে—চলি২।

(মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, ১৮৫৯)

—এখানে 'ঘুরায়ে', 'সেইরূপ' প্রভৃতি দু'একটি শব্দ ব্যতিরেকে বাকি অংশ যে ত্রুটি মুক্ত চলিত ভাষায় রচিত, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। যাইহোক, প্যারীচাঁদের ব্যবহৃত বাংলায় যা কিছু ত্রুটি ছিল, তা সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করল কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৬০) হাতে। অবশ্য একথা ঠিক যে, কালীপ্রসন্ন অনেকাংশে প্যারীচাঁদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু অবিমিশ্র চলিত বাংলার সুষ্ঠু ব্যবহারে কালীপ্রসন্ন প্যারীচাঁদ অপেক্ষাও অনেক বেশি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর পূর্ব পর্যন্ত কোন লেখকই অবিমিশ্র চলিত ভাষায় আদ্যন্ত কোনকিছু রচনা করেন নি। হয় তা

সাধু ও চলিতের মিশ্রণ, নতুবা চলিত ভাষার খণ্ডিত ব্যবহারই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খাঁটি মুখের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি উচ্চারণ অনুসরণে তিনি বানানগুলির ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যাকরণের প্রচলিত অনুশাসন রক্ষা করেন নি। বাস্তবিক, আজকের দিনেও কালীপ্রসন্নের মত দুঃসাহস দেখাবার ক্ষমতা খুব কম জনেরই আছে স্বীকার করতে হয়।

—সময় কারুরই হাত ধরা নয়—নদীর স্রোতের মত—বেশ্যার যৌবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত কারুরই অপেক্ষা রাখে না। গির্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে দশটা বেজে গ্যালো, সোঁ সোঁ করে একটা বড় ঝড় উঠলো—রাস্তার ধূলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে—মেঘের কড়মড় কড়মড় ডাক ও বিদ্যুতের চকমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মা'র কোলে কুণ্ডুলী পাকাতে আরম্ভ কল্লে—মুষলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।

(হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা)

কিংবা,

এবার অমুক বাবুর নতুন বাড়িতে পূজার ভারি ধূম। প্রতিপদাদি কল্পের পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েচে, আজও চোকে নাই—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে বাড়ি গিস্‌গিস্‌ কচ্চে। বাবু দেড় ফিট উচ্চ গদির উপর তসর কাপড় পরে বার দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হবীশ্বর ন্যায়লঙ্কার সভাপণ্ডিত, অনবরত নস্য নিচ্চেন ও নাসানিঃসৃত রঙ্গীন কফজল জাজিমে পুচ্চেন।

(ঐ)

কালীপ্রসন্ন তাঁর রচিত নক্‌শায় কলকাতার খাঁটি 'ককনি' বুলি—অর্থাৎ কলকাতার নিম্ন সমাজে প্রচলিত চলিত ভাষার ব্যবহার করেছেন। মনে রাখতে হবে কালীপ্রসন্নের আবির্ভাবের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব ঘটেছিল। সুতরাং কালীপ্রসন্নের কৃতিত্বকে কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তবু বঙ্কিম

প্যারীচাঁদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে কালীপ্রসন্নের যে তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, তার কারণ নিহিত রয়েছে বঙ্কিমের মানসিকতায়। বঙ্কিম মার্জিত রুচি সম্পন্ন ছিলেন। রুচি বিগর্হিত আচরণ অথবা রচনা বঙ্কিমের পক্ষে ছিল অসহনীয়। কিন্তু কালী-প্রসন্নের রুচির প্রশংসা করতে না পারলেও, তাঁর ব্যবহৃত আশ্চর্য ভাষা যে সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে না।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম যে কেবলমাত্র বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গেই যুক্ত তা নয়, বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিবর্তনেও তাঁর একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। অবশ্য একথা সত্যি যে, সাধু গদ্য রচনায় দীনবন্ধু মোটেই কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হন নি। দীনবন্ধুর সাধু গদ্য যে কি পরিমাণে সংস্কৃত গন্ধী, নিশ্চল, আড়ষ্ট ও কৃত্রিম তা উদ্ধৃতাংশ থেকেই বোঝা যাবে—

এই ঘোর রজনী, সৃষ্টি সংহারে প্রবৃত্ত প্রলয় কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত; আকাশমণ্ডল ঘনতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; বহ্নিবাণের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত; প্রাণী মাত্রেই কালনিদ্রানুরূপ নিদ্রায় অভি-ভূত; সকলে নীরব; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল এবং তস্কর নিকরের অমঙ্গলকর কুক্কুরগণের ভীষণ শব্দ;—ইত্যাদি।

(নীলদর্পণ: ১৮৬০)

কিন্তু অপর পক্ষে দীনবন্ধু,

মহাদেব! বোম্ ভোলানাথ! নিস্তার কর মা, তোমার গণেশের মুণ্ডু শনির দৃষ্টিতে উড়ে গেল। বাপ—(চিত হইয়া শয়ান) রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্মলজ্জা মান মর্যাদা পরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি তুমি কি ছিলে কি হয়েছ। তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।

(সধবার একাদশী: ১৮৬৬)

—এরকম সজীব বাংলাও ব্যবহার করেছেন। দীনবন্ধু তাঁর নাটকের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের জন্য অমার্জিত গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। বলাবাহুল্য এই অমার্জিত গদ্যকে কোন কোন সমালোচক মিশ্রভাষা কিংবা প্রাদেশিকতা দুষ্ট বলে মন্তব্য করলেও এর প্রাঞ্জলতাকে যে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না তার প্রমাণ পূর্বের উদ্ধৃতাংশটি।

মহাকবি মধুসূদনের একমাত্র গদ্যকাব্য 'হেক্‌টর বধে' (১৮৭১) সাধু বাংলা ব্যবহৃত হলেও, মাঝে মধ্যে চলিত বাংলারও বেশ ঘনিষ্ঠ অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।—

হায় প্রিয়ে। বিধাতা কি তোমার কপালে এই লিখেছিলেন,
যে অবশেষে তুমি আরগস্ নগরীর কোন ভর্ত্রিনীর আদেশে,
অশ্রুজলে আর্দ্রা হইয়া নদনদী হইতে জল বহিবে,…

—তবে এরকম ব্যবহারের ক্ষেত্র নিতান্তই সীমিত।

ধর্মজগতের অধিবাসী স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। বিশেষ করে চলিত বাংলার বিবর্তনে বিবেকানন্দের স্বল্প পরিমিত অথচ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিবেকানন্দের রচনাবলীর অধিকাংশই বিদেশী ভাষায় রচিত। বলাবাহুল্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই এরা মূল্যহীন। কিন্তু তিনি চিঠিপত্রাদি, ডায়েরী কিংবা ভ্রমণ কাহিনীতে যে গদ্য ব্যবহার করেছিলেন, তা কলকাতার খাঁটি 'ককনি' বুলি। এই প্রসঙ্গে কলকাতার ভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষে তাঁর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে, "বাঙ্গালাদেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোনটি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কল্‌কেতার ভাষা। পূর্ব্ব, পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কল্‌কেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়,

তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন্ ভাষা লিখতে হবে।”

অতএব ভাষার ব্যাপারে বিবেকানন্দ যে কেন কলকাতার চলিত ভাষার সমর্থক, তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। বিবেকানন্দের মতে, “পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট ; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না ? চলতি ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না ? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে ?…স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, —তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না ; সেই ভাব, সেইভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিক ফেরাও সেদিকে ফেরে ; তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না।” (ভাব্‌বার কথা : ১৩১৪)

বিবেকানন্দ স্বয়ং বলেছেন, “ভাষাকে করতে হবে, যেন সাফ্ ইস্পাৎ, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—”, তাঁর নিজের ব্যবহৃত ভাষার ক্ষেত্রেও তিনি ঠিক তাই করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত চলিত ভাষাও ইস্পাতের ন্যায়ই একাধারে বলিষ্ঠ এবং শক্তিশালী। ভাষাকে তিনি অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন নিজের ইচ্ছামত—

> বলি রঙের নেশা ধরেছে কখন কি ? যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে ? হুঁ, বলি—এই বেলা গঙ্গা মা'র শোভা যা দেখবার দেখে নাও ; আর বড় একটা কিছু থাকবে না। দৈত্য দানবের হাতে পড়ে এসব যাবে।

সাধু বাংলার ক্ষেত্রে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্থান, তেমনি চলিত বাংলার ক্ষেত্রে স্থান প্রমথ চৌধুরীর। অবশ্য বিদ্যাসাগর যেমন সাধু বাংলা গদ্যের জনক রূপে অভিহিত হন, চলিত বাংলার ক্ষেত্রে

প্রমথ চৌধুরীকে সেই একই বিশেষণে বিশেষিত করা না গেলেও, অন্ততঃ বাংলা ভাষার বিরোধের ক্ষেত্রে একজন সুষ্ঠু মীমাংসাকারী রূপে তাঁর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে অনেকেই যে চলিত বাংলায় কিছু কিছু রচনা করেছেন, তা আমরা দেখেছি। আবার একাধিক ব্যক্তিকে আমরা চলিত বাংলার সমর্থনে অভিমত প্রকাশ করতেও লক্ষ্য করে থাকি। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখদের নাম স্মরণীয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এতসব সত্ত্বেও ভাষা সমস্যার ক্ষেত্রে তেমন কোন স্থায়ী সমাধান লক্ষ্য করা যায় নি। সাধুভাষা পূর্বের মতই আধিপত্য বিস্তার করে চলছিল। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীকেই আমরা প্রথম দেখি এই ভাষা সমস্যার ক্ষেত্রে স্থায়ী মীমাংসাকারী রূপে আত্মপ্রকাশ করতে। এবং এই মীমাংসা তাঁর সম্পাদিত প্রখ্যাত 'সবুজ পত্রে'র (১৯১৩) মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। যদিও প্রমথ চৌধুরীর ব্যবহৃত চলিত ভাষা তাঁর প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বেকার কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র ন্যায় শক্তিশালী ও তীক্ষ্ণ নয়। বরং বলা যেতে পারে যে, তাঁর চলিতভাষা অনেকক্ষেত্রে সাধুভাষারই নামান্তর। একদিকে তা যেমন মার্জিত, অপরদিকে তেমনি কৃত্রিম। হুতোমের ভাষার মত জীবন্ত ও প্রাঞ্জল নয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর ভাষা যথেষ্ট স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক। কিছু নিদর্শন গ্রহণ করা যেতে পারে—

"খানিকক্ষণ পর,—কতক্ষণ পর তা বলতে পারিনে,—বেহারাগুলো সমস্বরে ও তারস্বরে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে। এদের গায়ের জোরের চাইতে গলার জোর যে বেশি, তার প্রমাণ পূর্ব্বেই পেয়েছিলুম,—কিন্তু সে জোর যে এত অধিক, তার পরিচয় এই প্রথম পেলুম। এই কোলাহলের ভিতর থেকে একটা কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল—সে হচ্ছে রামনাম। ক্রমে আমার পাঁড়েজীটিও বেহারাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে "রামনাম সৎ হ্যায়" "রামনাম সৎ হ্যায়" এই মন্ত্র অবিরাম আউড়ে যেতে লাগলেন। তাই শুনে

আমার মনে হ'ল যে, আমার মৃত্যু হয়েছে, আর ভূতেরা পাল্কিতে চড়িয়ে আমাকে প্রেত পুরীতে নিয়ে যাচ্ছে।"

প্রমথ চৌধুরীই যে প্রথম চলিত ভাষাকে নির্ভয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন শুধু তাই নয়, তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব হ'ল, যে চালত ভাষা তাঁর পূর্ব পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃতিলাভে ছিল অসমর্থ, তাকে সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভে সহায়তা করা। এবং আজকের দিনে যে সাধুভাষা অপেক্ষা চলিত ভাষার প্রয়োগ ক্ষেত্রই অধিক, তার মূলেও প্রমথ চৌধুরীর অবদান বর্তমান। সুতরাং বাংলা চলিত ভাষা রচনার ক্ষেত্রে তাঁকে প্রথম পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া না গেলেও তাঁর যে একটা বিশেষ স্থান বাংলা চলিত ভাষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হয়ে আছে এবং চিরকাল থাকবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথও প্রথম চৌধুরীর ভাষা রীতিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। শুধু মাত্র সমর্থন জানান নয়, নিজেও চলিত ভাষার শক্তি ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ব্যাপক ভাবে চলিত ভাষার ব্যবহারে মনোনিবেশ করেন। এবং সার্বভোম প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারের ফলেই বাংলা চলিত ভাষার যে কেবলমাত্র সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভবপর হ'ল তাই নয়, বলা যেতে পারে চরম রূপলাভ করে নিজের অধিকার-ক্ষেত্র বাড়িয়ে নিল অনায়াসে। পরিশেযে, রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত চলিত ভাষার কিছু নিদর্শন গ্রহণ করে বর্তমান আলোচনা সমাপ্ত করা যেতে পারে।—

(ক) আমি প্রাচ্য, আমি আসিয়াবাসী, আমি বাঙ্গলার সন্তান, আমার কাছে য়ুরোপীয় সভ্যতা সমস্ত মিথ্যে—আমাকে একটি নদী তীর, একটি দিগন্ত বেষ্টিত কনক সূর্য্যাস্ত রঞ্জিত শস্যক্ষেত্র, একটুখানি বিজনতা, খ্যাতি প্রতিপত্তি-হীন প্রচণ্ড চেষ্টাবিহীন নিরীহ জীবন, এবং যথার্থ নির্জ্জনতাপ্রিয় একাগ্র-গভীর ভালবাসা পূর্ণ একটি হৃদয় দাও—আমি জগদ্বিখ্যাত সভ্যতার গৌরব, উদ্দাম জীবনের উন্মাদ আবর্ত্ত, এবং অপর্য্যাপ্ত প্রবল উত্তেজনা চাইনে।

(য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি : ১৮৯০)

(খ) কাল অনেকদিন পরে সূর্যাস্তের পর, ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদি অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হা হা করছে- কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা। কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে;

(ছিন্নপত্র : ১৮৯৫)

(গ) সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।

(লিপিকা : সন্ধ্যা ও প্রভাত : ১৩২৬)

(ঘ) এদিকে মধুসূদনের পক্ষে কুমু একটি নূতন আবিষ্কার। স্ত্রীজাতির পরিচয় পায় এ পর্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষের অল্পই ছিল। ওর পণ্য জগতের ভিড়ের মধ্যে পণ্য-নারীর ছোঁওয়াও ওকে কখনও লাগে নি। কোনো স্ত্রী ওর মনকে কখনো বিচলিত করে নি এ কথা সত্য নয়, কিন্তু ভূমিকম্প পর্যন্তই ঘটেছে—ইমারত জখম হয়নি।

(যোগাযোগ : ১৩৩৪-৩৫)

(ঙ) মন যদি কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে—অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে, তাই করতে গিয়েই তার হবে মরণ। তার পরে কিছুদিন যেতেই কিষ্কিন্ধ্যা জেগে উঠবে, কোন্‌ হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে মনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। তখন আবার হবে টেনিসনের সঙ্গে পুনর্মিলন, বায়রণের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ, ডিকেন্‌স্‌কে বলব 'মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য তোমাকে গাল দিয়েছে।'

(শেষের কবিতা : ১৩৩৫)

(চ) উঠলুম বিলেতে গিয়ে, জীবন গঠনে আরম্ভ হ'ল বিদিশি কারিগরি— কেমেস্‌ট্রিতে যাকে বলে যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি। এর মধ্যে ভাগ্যের খেলা এই দেখতে পাই যে, গেলুম রীতিমত নিয়মে কিছু বিদ্যা শিখে নিতে— কিছু কিছু চেষ্টা হ'তে লাগল, কিন্তু হয়ে উঠল না। মেজবৌঠান ছিলেন, ছিল তাঁর ছেলেমেয়ে; জড়িয়ে রইলুম আপন ঘরের জালে। ইস্কুল-মহলের আশে-পাশে ঘুরেছি; বাড়িতে মাস্টার পড়িয়েছেন, দিয়েছি ফাঁকি। যেটুকু আদায় করেছি সেটা মানুষের কাছাকাছি থাকার পাওনা।

(ছেলেবেলা : ১৩৪৭)

বাংলার লোকসঙ্গীত বিচিত্রা

গানের দেশ এই বাংলা দেশ। এর আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে গানের সুরলহরী। তার ওপর বারোমাসে তের-পার্বণ তো লেগেই আছে। আর সেই সব পালা—পার্বণকে উপলক্ষ করে যে সব উৎসব—অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তার প্রধান অঙ্গই হল গান। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল গানই নয়, নৃত্য সহযোগে গীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে। অর্থাৎ আনন্দ প্রকাশের যে দুটি প্রধান মাধ্যম—সেই নৃত্য এবং সঙ্গীতকেই পল্লীবাংলার উৎসব কলায় অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয়েছে। সত্যিকথা বলতে কি, গান এবং নৃত্য ব্যতিরেকে যে পূজা-পার্বণ বা উৎসবকলা অনুষ্ঠিত হতে পারে, তা একসময়ে পল্লীবাংলার মানুষের কল্পনার ছিল অতীত। সঙ্গীতই ছিল সেদিন পল্লীবাংলার উৎসব কলার প্রাণস্বরূপ। যদিও আধুনিক সভ্যতা ক্রমে ক্রমে পল্লীবাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নিতে বসেছে আর সেই সঙ্গে বিস্মৃতির পথে চলেছে আমাদের পরম গৌরবের লোকসঙ্গীতের ধারা। তবু আজও দেখা যায়, সারাদিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় পল্লীর মানুষ কোন এক মুক্তাঙ্গণে একত্রে মিলিত হয়ে লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে অবসর বিনোদনের চেষ্টায় রত। বাস্তবিক, আজ আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে মানসিক আনন্দ বিধানের নানা উপকরণ সৃষ্টি হয়েছে সত্য। কিন্তু একসময়ে যখন সে সবের কোন ব্যবস্থা ছিল না, তখন পল্লীর মানুষকে একান্তভাবে তার নিজস্ব উপকরণের ওপরই নির্ভর করে থাকতে হত। বলা বাহুল্য সেদিনও তারা কিন্তু কম আনন্দ উপভোগ করেনি। বরং বললে সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হবে না যে, সেদিনকার মানুষের আনন্দ ছিল আজকের তুলনায় নির্মল ও অকৃত্রিম। যদিও আজকের পল্লীবাংলায়

মানুষ যারা ক্রমেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে, তাদের কাছে এ সমস্ত উপকরণ লজ্জাকর বলে মনে হলেও হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সেখানকার প্রবীণেরা ঐকান্তিকতার সঙ্গে বাংলার সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার চেষ্টায় আজও রত। সেদিন হয়ত আর দূরে নেই, যেদিন পল্লীবাংলার মুক্তাঙ্গণে বৈচিত্র্যময় লোকসঙ্গীতের সুর আর ধ্বনিত হবে না। কিন্তু আজও নানা পালা-পার্বণে বেজে উঠে ধামসা, মাদল, বাঁশী, একতারা কিংবা গুপীযন্ত্রের ঐকতান বাদন। আর তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে মুক্তকণ্ঠে গেয়ে ওঠেন পল্লীবাংলার মানুষ কখনও টুসু, কখনও ভাদু, কখনও আবার এককভাবে বাউল কিংবা দেহতত্ত্বের গান। বাস্তবিক, এসব বাংলা এবং বাঙালীর কেবলমাত্র নিজস্ব সম্পদই নয়, গৌরবের সামগ্রীও বটে। বর্তমান রচনাটিতে বংলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লোকসঙ্গীতের বিষয় আলোচিত হল।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলার 'জাগান গানে'র কথা। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীপূজোর দিন রাত্রে এই গান মাদল, ধামসা প্রভৃতি সহযোগে পুরুষদের দ্বারা গীত হয়ে থাকে। গোয়াল ঘরের সামনে বসে এই গান গাইবার রীতি। ঐদিন গোয়ালে গরুর সামনে সারারাত প্রদীপ ও ধুপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। হলুদ মিশ্রিত জলে গরুর পাগুলি ধুইয়ে দিতে হয় এবং কপালে ও শিঙে সিঁদুর ও মেথি মাখিয়ে দেওয়া হয়। কৃষিপ্রধান বাংলা-দেশের মানুষের কাছে যে গরু এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বৎসরের কয়েকটি দিন নির্দিষ্ট গরুর আরাধনার জন্য। শুধুমাত্র দৈনন্দিন জীবনেই যে গরুর প্রয়োজন তা নয়, প্রতিটি হিন্দুর কাছেই গরু সাক্ষাৎ মা ভগবতী। সুতরাং এ কারণেও কয়েকটি দিন নির্দিষ্ট দেবী ভগবতীর অর্চনার জন্য। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ভগবান স্বয়ং এই সময়ে গৃহস্থের ঘরে ভগবতীকে

কি ভাবে রাখা হয়েছে তা নাকি স্বচক্ষে দেখতে আসেন। কালীপুজোর দিন রাত্রে শুধুমাত্র পূর্বোল্লিখিত 'জাগান গান'ই গাওয়া হয়। আর ভগবতীর পুজোটা হয়ে থাকে পরের দিনে। গব্য·ঘৃত, গুড় আর আতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে প্রস্তুত পিঠে হল পুজোর উপকরণ। পুজোর পরদিন বাড়ীর সীমানা থেকে গোয়াল ঘরের ভেতর পর্যন্ত আলপনা দেওয়ার রীতিও এই উপলক্ষে প্রচলিত। আলপনার উপকরণটাও একটু বিচিত্র ধরণের। ঢেঁড়স গাছ জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর সেই ভিজে গাছের নালের সঙ্গে চালের গুঁড়ো মিশিয়ে এই উপকরণ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য এই তিনদিন অর্থাৎ কালীপুজোর দিন থেকে পরের দুদিন পর্যন্ত কোন গরুকেই কোন কাজ করান হয় না। একটি 'জাগান গানে'র দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

জাগো মা লক্ষ্মী
জাগো মা ভগবতী
জাগে তো অমাবস্যার রাত
জাগে কা প্রতিফল
দেবী গো ময়লান
পাঁচ পুতা দশ ধেনু গায়রে।

এইবারে আসা যেতে পারে 'ঝাঙ্গোড়া গানে'র কথায়। সাধারণতঃ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে পাড়ার প্রতিবেশী সব একত্র মিলে এই গান গেয়ে থাকেন। এইদিন গৃহস্থের সব রকম কাজই বন্ধ। 'ঝাঙ্গোড়া গানে'র একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা গেল—

আদাড় বাদাড় ভাঙ্গি গেল
পুঁই শাকের ভরে
পেট পিঠ ফাইটে গেল
খোলা পিঠের ভরে।

গাজনের সময় যে গানের প্রচলন খুব বেশি দেখা যায়, তা হল 'ছৌ-নাচে'র গান। নাম থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এই গান নৃত্য-সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে দুর্গাপুজোর সময়ও 'ছৌ-নৃত্য' অনুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, 'ছৌ-নাচে'র বিষয়বস্তু হল রামায়ণ, শিবকেন্দ্রিক কোন বিষয় নয়। রামের জন্ম থেকে রাবণের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাবলী 'ছৌ-নাচে'র বিষয়। এই অনুষ্ঠানে মুখোস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সমস্ত 'ছৌ-নাচে'রই প্রারম্ভে সিদ্ধিদাতা গণেশের বন্দনা করা হয়ে থাকে। গণেশ বন্দনা বিষয়ক পদটি সব 'ছৌ-নাচে'ই এক। এখানে পদটির উল্লেখ সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

সিন্দুর বরণ অঙ্গ
মুষিক বাহন,
গলে দুলে তুলসীমালা
কপালে চন্দন।
নমো নারায়ণ,
গণেশ দেব
হর-গৌরীর নন্দন।

গনেশ বন্দনার পর শুরু হয় 'ছৌ-নাচ'। এবং তা চলে সারারাত ধরে। কয়েকটি 'ছৌ-নাচে'র গান উদ্ধৃত করা গেল যেগুলিতে স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বশক্তির পরিচয় লক্ষ্য করা যাবে—

ক) আলো রাতের কালো শাড়ী
জ্যোৎস্নায় শুকায় ধান
চল গেঁদাফুল জলকে যাবো
ঢেঁকিতে কুটুক ধান।

খ) আসরেতে ফুল ফুটেছে
নীল, কালো, সাদা—
কোন ফুলেতে কৃষ্ণ আছেন
কোন্ ফুলে রাধা ;
কালো ফুলে কৃষ্ণ আছেন
সাদা ফুলে রাধা।

গ) আকাশেতে চাঁদ উঠেছে
চাঁদ বটে কি গৌরহরি,
ও ললিতে চিন্‌তে নারি
আমায় চিনায় দাও হে বংশীধারী

ঘ) পান দিব সুপারি দিব
চুন তো দিব না
অর্ধেক যৌবন দিব
মন তো দিব না।

এইবার আমরা আসতে পারি 'পাতা-নাচে'র কথায়। ভাদ্রমাসে ইন্দ্রপূজার আগের দিন যে পার্শ্ব একাদশী, সেইদিন রাত্রে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে গান সহযোগে 'পাতা নাচে'র অনুষ্ঠান। ঐদিন ছোট ছোট সব ছেলেমেয়েকে উপবাস করে থাকতে হয়। সন্ধ্যেবেলায় গ্রামের মোড়ল করমগাছের একটা ডাল কেটে নিয়ে এসে গ্রামের একটি বিশেষ স্থানে পুঁতে দেন। ছেলেমেয়েরা সারাদিন উপবাসের পর সন্ধ্যার সময় স্নান সেরে ছোট ঝুড়ি করে ধানগাছের পাতা সংগ্রহ করে ঘরে নিয়ে আসে। তারপর নতুন জামাকাপড় পরে পুজোর উপকরণ নিয়ে উপস্থিত হয় মোড়লের পোঁতা করম গাছের ডালের কাছে পুজোর জন্যে। পূজার উপকরণের মধ্যে থাকে চালের গুঁড়ি, চিঁড়ে, সাদা-চন্দন, আস্ত হলুদ, বোঁটা সহ আস্ত কাঁকুড়, কাঁকুড়ের পাতা

প্রভৃতি। এ ছাড়াও বেলপাতা, হরিতকী, কেঁওয়া ফুল প্রভৃতিও লাগে। অনুষ্ঠানে ধানগাছের পাতাকেই বিশেষভাবে ফুলের মত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এরপর ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকে করম গাছের ডালের পাতায় সিঁদুরের ফোঁটা, গুঁড়ি, চন্দন প্রভৃতি দিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে ডালের সঙ্গে আলিঙ্গন করে। তারপর ডালের তলায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পূজার উপচার সব ঐ ডালের তলায় রেখে যে যার ঘরে ফিরে যায়। বাড়ি ফিরে তারা সব গুড় ও চিঁড়ে আহার করে। তারপর রাত্রে শুরু হয় 'পাতানাচে'র অনুষ্ঠান। কয়েকটি 'পাতানাচে'র গান উদ্ধৃত করা গেল—

ক) গাছের মধ্যে তুলসী
পাতার মধ্যে পান্‌রে।
স্ত্রীর মধ্যে রাধিকা
পুরুষ ভগবানরে ॥

খ) পালের মধ্যে গাভী ভাল
ধবলী শ্যামলী রে।
গড়ের মধ্যে রাজা ভাল
শ্রীরাম-লক্ষ্মণরে ॥

গ) শাল গাছে শালকুমড়া
কদম গাছের কলি।
ভোঁদার গায়ে লালগামছা
চটক দেখে মরি ॥

ঘ) পুকুর কাটালে বন্ধু,
না বাঁধিলে ঘাট হে,
ডালিম লাগাই বন্ধু,
গেলে পরদেশ হে,

পাকিল ফুটিল ডালিম,
চোয়ে তুলে খায় হে,
ঘরে না বিদেশ গেল
যৌবন বহে যায় রে।

'পাতানাচ' কেবলমাত্র পুরুষদের। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পুরুষেরা স্ত্রীলোকের মত শাড়ী, ফুল, শাঁখা প্রভৃতিতে সজ্জিত হয়ে এই নাচে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই নাচে বাজে মাদল, ঝাড়, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। সারিবদ্ধভাবে পুরুষেরা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে সাঁওতাল নৃত্যের অনুসরণে নাচে। সঙ্গে বাজে মাদল, করতাল প্রভৃতি। তবে 'পাতানাচে'র সঙ্গে যে এর প্রধান পার্থক্য, তা হল—এই অনুষ্ঠানে 'পাতানাচে'র মত সমবেত নৃত্য হয় না। এটি একক নৃত্যানুষ্ঠানের বিষয়। বলা বাহুল্য সঙ্গে গানও চলে। সেই গানের তালে তালেই চলতে থাকে নাচ।

বাংলা দেশের 'টুসু গান' সুপরিচিত ও জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। টুসুর পূজা উপলক্ষে পৌষসংক্রান্তির রাত্রে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। সারারাত ধরে চলে ওই গানের অনুষ্ঠান এবং শেষ হয় পরের দিন সকালে। এই গান গাইতে গাইতেই টুসুকে ভাসান দেওয়া হয়ে থাকে। 'টুসু গান' গীত হয় সমবেতভাবে। এই গানের সঙ্গে কিন্তু কোন নাচ হয় না। কয়েকটি 'টুসু গানে'র উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে—

ক) বাঁকুড়াতে দেখে এলাম
শাল গাছে বেল ধরেছে,
আমার দেশের কারবারীদের
লাউফুলে মন মজেছে—
এক বাঁকে ফুটেছে দুটি ফুল
মেলানি বেচে তোল।

খ) বিবাহ যে দিলে ভাইরে
বড় নদীর সে পারে
এত বড় পৌষ পরবে
রাখলে ভাই পরের ঘরে।
ও ভাই আমার মন কেমন করে
আমার দুনয়নে জল ধরে—
ও ভাই আমার মন কেমন করে।

গ) টুসুর পরব এসেছে ঘরে
শাঁখা শাড়ি কোমরে বেড়ি
কানে দুল দাও এইবারে—
টুসুর পরব এসেছে ঘরে।
আলতা ফিতা মাথায় কাঁটা
পা সাজাব নূপুরে
টুসুর পরব এসেছে ঘরে।

ঘ) বাড়ীর নামই কলাগাছটি
কেটে করব কলগাড়ী
কলগাড়ীতে চেপে যাবো
ডাক্তারবাবুর ঘরবাড়ী
এসো ডাক্তার বস খাটে
টুসুর হাত দেখ ঘড়ি ঘড়ি
আমার টুসু ভাল হলে
হাতে দেব চ্যান্ ঘড়ি।

বাংলাদেশের 'ভাদুগান'ও সুপরিচিত ও জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। তবে উল্লেখযোগ্য যে, 'টুসু গানে'র সঙ্গে 'ভাদুগানে'র সুরগত কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবলমাত্র সময়ের।

দুর্গাপূজোর সময় ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত গীত সহযোগে আর এক প্রকার নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হতে দেখা যায়। একে বলে 'কাঠিনাচ'। এই অনুষ্ঠানেও পুরুষেরা 'পাতানাচে'র মত মেয়ে সেজে নেচে থাকে। সঙ্গে বাজে মাদল, করতাল প্রভৃতি। তবে 'পাতা নাচে'র সঙ্গে এর যে প্রধান পার্থক্য, তা হল এই অনুষ্ঠানে 'পাতানাচে'র মত সমবেত নৃত্য হয় না। এটা একক নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যাপার। বলাবাহুল্য সঙ্গে গানও চলে। সেই গানের তালে তালেই নাচ চলতে থাকে। 'কাঠিনাচে'র একটি দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে দেওয়া গেল :

উপর ডালে কারি কুরি মাগো
না মোর ডালে বাসা ;
ধরব ধরব মনে করি মাগো
মনে রইল আশা ;
রাত হল অবশেষ, যাতে হবেক লঙ্কাদেশ,
বঁধু হে ভাঙ্গো তুমি গায়ের আলেস।

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না বলেই অনেকের ধারণা। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলন গুপ্ত কবির সমর্থন লাভ করেনি।[১] বরং বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলন প্রসঙ্গে গুপ্ত কবির ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপই প্রকাশিত হয়েছে 'বিধবা-বিবাহ', 'বিধবা-বিবাহ আইন' প্রভৃতি কবিতায়। কবি বলেছেন ঃ

বচন রচন করি কত কথা বলে।
ধর্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে ॥
'পরাশর' প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে এযে দেখি সাগরের ঢেউ ॥

কিংবা,

সকলেই তুড়ি মারে বুঝেনাক কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ ॥
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ-ঘটন ॥

পুনরায়,

যেখানে সেখানে শুনি এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব ॥

---

১. 'ঈশ্বরগুপ্ত বিধবা-বিবাহ আদৌ সমর্থন করিতেন না; কাজেই বিধবা-বিবাহ ও তাহার উদ্যোক্তা উভয়কেই তিনি শাণিত ভাষায় ব্যঙ্গ করিয়াছেন।'

—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য', পৃঃ ২০০।

সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে॥

অথবা,

অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।
তাতে বিধবাদের কুলতরী অকূলেতে কূল পেল না॥

বাস্তবিক এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে ঈশ্বরগুপ্তকে বিধবা-বিবাহ তথা বিদ্যাসাগর বিরোধী বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এবং অনেকেই যে গুপ্ত কবিকে প্রাচীন পন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিবিরোধী বলে অভিহিত করে থাকেন, তার অন্যতম যুক্তি হিসাবে তাঁরা বিধবা-বিবাহ তথা বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গে কবির বিরূপ মনোভাবের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের পরিচয় এইখানেই শেষ নয়। অন্যত্র কবিকে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হতে দেখা গেছে। 'সংবাদ প্রভাকরে'র নানাস্থানেই বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কবির সশ্রদ্ধ মনোভাবের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতন দেড়শত টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে তিনশত টাকা হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে 'প্রভাকরে' বলা হয়েছিল —"গবর্নমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারি নানা শাস্ত্রাধ্যাপক পরম পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও কার্য্যদক্ষতা এবং এই দেশ মধ্যে বিদ্যাপ্রভাসন্দীপন বিষয়ে অবিচলিত অনুরাগ দৃষ্টি করিয়া গবর্নমেণ্ট তাঁহার মাসিক বেতন তিনশত টাকা নিরূপণ করিয়াছেন, পূর্ব্বে তিনি ১৫০ টাকা প্রাপ্ত হইতেন। শিক্ষা কৌন্সেলের মেম্বর মহাশয়দিগের এই বিবেচনা অতি-সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তুল্য সর্ব্ববিষয়ে সুযোগ্য এবং সরল স্বভাব ব্যক্তি গবর্নমেণ্টের অধীনে প্রায় দৃষ্ট হয় না, এতদ্দেশীয় লোকেরা সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত হয়েন এই উদ্দেশ্যে তিনি অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রম করিতেছেন, স্বয়ং অনেক পুস্তক রচনা

করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা সংস্কৃত কালেজে যে সকল সুনিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তত্তাবৎ ছাত্রদিগের পক্ষে অতিশয় মঙ্গলজনক বলিতে হইবেক, অতএব এতাদৃশ সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত লোকের মহদ্ গুণের পুরস্কার করা গবর্নমেণ্টের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, এজন্য তাঁহারা প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেন না, না করিলে বরং অবিবেচনা প্রচার হইতে পারে।"[২]

বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গ ভাষাভাষী ইস্কুলগুলির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে তাঁর মাসিক বেতন তিনশত টাকা থেকে পাঁচশত টাকা নির্ধারিত হওয়ার সংবাদে অপরিসীম পরিতোষ প্রকাশ করা হয়েছিল 'সংবাদ প্রভাকরে'—"আমরা অপর্য্যাপ্ত সন্তোষ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, রাজপুরুষেরা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ৫০০ টাকা মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটরির পদে ৩০০ টাকা পাইয়া থাকেন, অধুনা বঙ্গভাষার বিদ্যালয় সকলের তত্ত্বাবধারণ জন্য ঐ নূতন পদে অতিরেক ২০০টাকা প্রাপ্ত হইবেন, এবং ঐ বর্ত্তমান পদের নিমিত্ত তিনি গবর্নমেণ্ট হইতে "কাণ্ট্রলার আব বর্ণাকিউলর স্কুলস" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম, লেপ্টেনেণ্ট গবরনর শ্রীযুত হেলিডে সাহেব বিদ্যাসাগরের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন, এবং কহিয়াছেন, এ ব্যক্তি যদ্রূপ যোগ্য ও মহামনুষ্য তাহাতে ইঁহাকে ১০০০ টাকা বেতন দেওয়াই কর্তব্য হয়। বোধ করি, এই সুসংবাদে এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগী মনুষ্য মাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন।"[৩]

তৎকালীন লেপ্টেনাণ্ট গভর্নর শিক্ষা কাউন্সিলের অধ্যক্ষদের কাছে এদেশীয় ব্যক্তিদের মাতৃভাষা শিক্ষা বিষয়ে তাঁদের অভিমত

২. সংবাদ-প্রভাকর ; ৪ঠা জানুয়ারী, ১৮৫৪।
৩. সংবাদ প্রভাকর ; ৮ই জুলাই, ১৮৫৪।

জানাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও পুস্তক নির্বাচনে গুরুত্বদানের অনুকূলে মত প্রকাশ করতে গিয়ে 'সংবাদ প্রভাকরে' বলা হয়েছিল—"আমারদিগের বিজ্ঞসহযোগী সমাচার চন্দ্রিকা সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, শিক্ষা সমাজের অধীনস্থ কর্মচারিগণের মধ্যে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি উপযুক্ত ব্যক্তি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী বিদ্যাতেও তিনি বিলক্ষণ সুপণ্ডিত এবং সর্ব্ববিধায়ে বিচক্ষণ, স্বদেশের উপকার বর্দ্ধনেও তাঁহার বিচক্ষণ দৃষ্টি আছে।"[৪]

অনুবাদক এবং সার্থক গ্রন্থ রচয়িতা হিসাবেও বিদ্যাসাগরের প্রতি গুপ্ত কবির ছিল গভীর শ্রদ্ধা। বিদ্যাসাগর প্রণীত ও অনূদিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'জীবন-চরিত', প্রভৃতি গ্রন্থগুলির অবিমিশ্র প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রভাকরে'। এমন কি এশিয়াটিক সোসাইটির মাসিক পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের রচনা নিয়মিত প্রকাশের সিদ্ধান্তকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানান হয়েছিল—

"আমরা অবগত হইলাম, সংস্কৃত কালেজের সর্ব্বাধ্যক্ষ পণ্ডিতবর গুণাকর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রকাশিত মাসিক পুস্তকে বেণী সংহার, প্রসন্ন রাঘভ, নাগানন্দ প্রভৃতি ছয়খানা প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক যথানিয়মে ক্রমশঃ প্রকাশ করিবেন। এই সমাচারে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম, কেননা নানা বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় তদনুরূপ প্রশংসনীয় কার্য্য সমুদয়ে সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত।"[৫]

এইবার বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহকে ব্যঙ্গ করে গুপ্ত কবি যতই কবিতা লিখে থাকুন না কেন,

---

৪. সংবাদ প্রভাকর ; ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৪।

৫. ঐ ; ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫২।

তবু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মনে প্রাণে কবি এই আন্দোলনের সাফল্য কামনা করতেন। বিধবা-বিবাহ এবং এই বিষয়ে বিদ্যাসাগরের অভিমতকে প্রকাশ্য ভাবেই 'প্রভাকরে' সমর্থন জানান হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহৎ-প্রাণ ব্যক্তি যে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়ে পারে না বলেই ছিল গুপ্ত কবির স্থির বিশ্বাস। বিদ্যাসাগর রচিত 'বিধবা-বিবাহ চলতি হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫) নামক পুস্তিকাটি সম্বন্ধে 'প্রভাকরে' প্রকাশিত মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য—

"বিধবা বিবাহ উচিত কিনা, এই প্রস্তাব বিষয়ে সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপেল অদ্বিতীয় পণ্ডিত বর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি পরাশর সংহিতা হইতে যে সমস্ত প্রমাণ লিখিয়াছেন তাহা এক প্রকার অকাট্য বলিতে হইবেক। এ পুস্তক পাঠ করা হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়।"[৬]

অন্যত্র বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"হিন্দু বিধবাগণের বিবাহ বিষয়ের অধুনা জনসমাজে অতিশয় আন্দোলন হইতেছে ; এই বিষয় আমরা গত বাসরীয় পত্রে (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৫) লিখিয়াছি, বালিকাগণ শৈশবাবস্থায় বিধবা হইলে স্বামী বিরহে যে যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা অনেকেরি বিদিত আছে, অতএব ইহার আশু কোন প্রতিকার হইলে অনেক মঙ্গল সম্ভাবনা।"[৭]
পুনরায়,—

৬. সংবাদ প্রভাকর ; ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৫। ৭. ঐ ; ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৫।

"পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসার মহাশয় বিধবা বিবাহের কর্তব্যতা বিষয়ে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে, ঐরূপ পুস্তক সকল প্রকাশ পূর্ব্বক বিধবা মহিলাগণের বিবাহ বিষয়ে সাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি করা অতি আবশ্যক বলিতে হইবেক, যে মত কোন তরু রোপণ করিয়া অনবরত যত্নবারি সেচন না করিলে তাহার ফল দৃষ্টি হয় না, সেইরূপ কোন গুরুতর কার্য্য সাধন বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ও পরিশ্রম প্রভৃতির আবশ্যক করে, কঠিনতর কার্য্য সকল কোন মতেই অনায়াসে সাধ্য হইতে পারে না।"[৮]

—এই সকল বিবরণ থেকেই বোঝা যায় যে, গুপ্ত কবি 'বিধবা বিবাহ' ব্যাপারটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই গ্রহণ করেছিলেন এবং এর মঙ্গলকর দিকটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। 'বিধবা বিবাহে'র বিরোধিতা দূরের কথা, বরং যাতে এই আন্দোলন সার্থক হয়, সে বিষয়ে 'প্রভাকর' সে সময়ে সার্থক পথ নির্দেশকের বিরল ভূমিকা পালনে অগ্রণী হয়েছিল।

কিশোরী চাঁদ মিত্র প্রমুখেরা বৈষয়িক প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সার্থক করে তোলায় ব্রতী হলে 'প্রভাকরে' এ বিষয়ে বলা হয়েছিল—

"সম্প্রতি শ্রীযুত বাবু কিশোরী চাঁদ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্বান লোক হিন্দু বিধবা গণের পুনরুদ্বাহ নির্ব্বাহ নিমিত্ত অপর এক সভা করিয়াছেন। তাঁহার দিগের এমত প্রতিজ্ঞা হইয়াছে যে ব্যক্তি আপনার বিধবা কন্যা বা ভগিনীর বিবাহ দিবেন, এবং যিনি তাহার পাণিগ্রহণ করিবেন বিষয়কার্য্য দিয়া তাঁহার দিগকে প্রতিপালন করিবেন……প্রাগুক্ত সভার মেম্বরগণ যে অভিপ্রায় করিয়াছেন তাহা

৮. সংবাদ প্রভাকর ; ৯ই ফেব্রুয়ারী ; ১৮৫৫।

অতি উত্তম বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া অল্প আয়াস সাধ্য নহে, বিষয়কর্ম্ম দিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহারা ভদ্রলোক দিগের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রথা প্রচলিত করাইতে পারিবেন না, আদৌ হিন্দু মণ্ডলীর মধ্যে একতা সংস্থাপন করিতে হইবেক, এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ বিবাহ প্রদানের দোষাভাব প্রমাণ করিতে হইবেক ………শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি যে সকল মহামতি দলপতি ও প্রদেশবাসি ভূম্যধিকারী আছেন, তাঁহার দিগকে ঐক্য করা অতি আবশ্যক হইয়াছে, সম্বতি (সম্মতি) ব্যতীত কোন দেশের কোন প্রচলিত প্রথার অন্যথা হহতে পারে না, এই বিষয়ে বিশেষ স্মরণ রাখিয়া প্রাগুক্ত সভার গুণজ্ঞ মেম্বর মহাশয়েরা কার্য্য করিবেন।”[৯]

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুগভীর পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানে আস্থাশীল কবি, বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত পুস্তকের যুক্তি—তথ্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন—

“…সংস্কৃত কালেজের প্রধানাধ্যাপক অদ্বিতীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ পুস্তকে তিনি অনেক অকাট্য যুক্তি সকল প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং পরাশর সংহিতা প্রভৃতি প্রধান সংস্কৃত মূলগ্রন্থ হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।”[১০]

কবি ঈশ্বর গুপ্ত অবশ্য বয়স্কা বিধবা রমনীর বিবাহকে সমর্থন জানাতে পারেননি ঠিকই। কিন্তু অল্প বয়স্কাদের ক্ষেত্রে তিনি এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। বিশেষতঃ সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পুরোধা বিদ্যাসাগর

---

৯. সংবাদ প্রভাকর ; ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৫।

১০, সংবাদ প্রভাকর, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৫।

মহাশয়ের আন্তরিকতায় কবির বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলনকে নিঃসঙ্কোচে সমর্থন জানাতে কবি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেননি—

"সংপ্রতি বিধবার বিবাহ লইয়া সর্ব্বত্র মহা গোলযোগ হইতেছে, যেখানে সেখানে এইকথা ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। সাগরের তরঙ্গে অনেকেই ঝম্প প্রদান করিতেছেন, কিন্তু এ সাগর ক্ষুদ্র নহে, অতি ডাগর, লবণসাগর নহে, ক্ষীরোদসাগর বলিলেই হয়, সুতরাং তরঙ্গ-রঙ্গ অন্তরঙ্গ ভিন্ন কখনই বৈরঙ্গ হইবে না ; তবে বৃদ্ধজনেরা তরঙ্গ প্রসঙ্গ করত আসঙ্গক্রমে রঙ্গ ভঙ্গ যত করুন, কিন্তু এ তরঙ্গ বয়স্কের পক্ষে সুখকর ভিন্ন কখনই ভয়ঙ্কর হইবে না, কিন্তু এই তরঙ্গ প্রবাহে প্রাচীন তরণী উত্তীর্ণ হইয়া কূলপ্রাপ্ত হয় এমত বোধ্য নহে, ফলে তরুণী তরনীর পক্ষে বিশেষ কোন ব্যাঘাত দেখিতে পাই না।"[১১]

এই সব কারণেই মনে হয়, গুপ্ত কবি তাঁর রচিত কবিতায় 'বিদ্যাসাগর' অথবা 'বিধবা-বিবাহ' প্রসঙ্গে যে বিরূপতা প্রকাশ করেছেন তা নিছক পরিহাসরূপেই গণ্য হবার যোগ্য।

১১. সংবাদ প্রভাকর ; ২০শে মার্চ, ১৮৫৫।

বাউল কবি কুমুদরঞ্জন

ইদানীং রবীন্দ্রানুসারী কবিদের কাব্যের প্রতি আধুনিক পাঠকদের এক প্রকার নিষ্ক্রিয়ভাব বেশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একথা সত্য যে, এইসব কবিদের কেউ কেউ প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা-সম্পন্ন না হলেও, এঁদের অনেকেই যে সুকবি, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে না। এই রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজেরই অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, নরেন্দ্র দেব, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিবৃন্দের কাব্য প্রাচীন বাংলা কাব্যের সঙ্গে আধুনিক বাংলা কাব্যের যোগসূত্র রক্ষা করে আসছে। সুতরাং বাংলা কাব্যসাহিত্যে এঁদের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, তা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্যে এঁরা লালিত এবং রবীন্দ্র প্রভাবের দ্বারা যদিও এঁরা প্রত্যেকেই প্রভাবিত, তবু এঁদের কেউই নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেন নি। এই বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ হয়ত খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়, তবু স্বকীয়তা বলতে যা বোঝায়, তা এঁদের কাব্যে আছে। মূলধন বলতে এঁদের প্রত্যেকেরই প্রায় এক, কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, যৎসামান্য মূলধনের অধিকারী হয়েও এঁরা এঁদের কাব্যাঞ্জলি কাব্যলক্ষ্মীর শ্রীচরণে অর্পণ করে তৃপ্ত হয়েছেন, অন্তরে অনুভব করেছেন এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি!

কবি হিসেবে কুমুদরঞ্জনের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কুমুদরঞ্জনের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটনে একজনের সুমিত ভাষায় পাই —কবির গলায় 'বনমল্লিকা', বুকে 'বনতুলসী', কানে 'শতদল', পায়ে 'নূপুর', হাতে 'একতারা',—'অজয়ে'র তীরে 'স্বর্ণসন্ধ্যা'য় আপনার

গানে আপন হারা, মাতোয়ারা।—এইভাবে কুমুদরঞ্জনেরই রচিত কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়ে কবিকে চিত্রিত করা হয়েছে। মানুষ কুমুদরঞ্জন এবং কবি কুমুদরঞ্জন সম্বন্ধে এর অধিক সম্ভবতঃ আর কিছুই বলার নেই। কবির রচিত পুস্তকাবলীর নামকরণের মাধ্যমে কবিরই দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানসিক গঠনের পরিচয় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আর ঐ বর্ণনায় কবিকে বাউলরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। —তাঁর হাতে একতারা, তিনি বসে আছেন অজয়ের তীরে, তাঁর বুকে বনতুলসী, কানে শতদল, গলায় বনমল্লিকা, পায়ে নূপুর। —একতারা বাউলের একটি বাদ্যযন্ত্র, যাতে একটি মাত্র সুরই ঝঙ্কৃত হয়ে থাকে এবং সে সুর সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। কুমুদরঞ্জনের কাব্যেও বাউলের এই সরলতা এবং আন্তরিকতার পরিচয় রয়েছে। বলা হয়েছে, কবি বসে আছেন অজয়ের তীরে। বাস্তবিকই, এই অজয়ের তীরে কবির যে কেবলমাত্র বাসস্থানই অবস্থিত তা নয়, কবির কাব্যজীবনেও এর এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব বর্তমান। কবির বুকে বনতুলসী, কানে শতদল ও পায়ে নূপুর দিয়ে সজ্জিত করে তাঁকে এক ভক্তপুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। কবির কাব্যেও তাঁর আধ্যাত্মিকতার পরিচয় আমরা তাঁর কাব্য আলোচনাকালে যথা সময়ে লাভ করব। কুমুদরঞ্জনের কাব্যের যে সকল বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে, তা হল তাঁর কাব্যের সরলতা, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছের প্রতি তাঁর কবিমনের স্বাভাবিক এক আকর্ষণ, পল্লীপ্রীতি এবং পরিশেষে তাঁর ঈশ্বরপ্রীতি।

বর্তমানযুগ, আধুনিকযুগ। আধুনিক জীবনের জটিলতা, আধুনিক কাব্যে ও সাহিত্যেও প্রতিফলিত। বিশেষ করে, এই জটিলতা লক্ষণীয় আধুনিক যুগের কাব্যে, কেন না কাব্যেই জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। কিন্তু কবি কুমুদরঞ্জন আধুনিক কালের মানুষ হয়েও অতি আধুনিক মনের যে নন, তার প্রমাণ তাঁর কাব্য। কারণ তাঁর কাব্যে

আধুনিক মনের কোন পরিচয়ই মেলে না। আধুনিক যুগের প্রভাব কবিমনকে প্রভাবিত করতে পারে নি। সেইজন্য অতি আধুনিক কবিতায় যে সব লক্ষণ প্রকটরূপে দেখা যায়, সে সব লক্ষণ তাঁর কাব্যে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু একে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের—প্রভৃতি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের কাব্য সম্পর্কে এদের কোনটিই প্রযোজ্য নয়। অবশ্য শুনতে পাই—'জটিল অসুস্থ মনোবিকারের যুগে, যখন বস্তুর অভিঘাতে কামনার অতৃপ্তিতে, বিরুদ্ধ প্রভাবের আকর্ষণে কবির চিত্ত ভারসাম্যচ্যুত ও ছন্দোভ্রষ্ট, তখন একটি সহজ মন ও দ্বন্দ্বলেশহীন জীবনদর্শনের অধিকারী হওয়াই অভাবনীয় সৌভাগ্য।···আধুনিক যুগের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক এই বিরল মনোভঙ্গির সৌভাগ্যবান অধিকারী।'

আধুনিক যুগের কাব্যে যখন গদ্যছন্দের একাধিপত্য, ভাষার দুর্বোধ্যতা, অভিনব উপমা প্রয়োগ প্রভৃতি লক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে কুমুদরঞ্জনের কাব্যে এই সকলের অনুপস্থিতি স্বাভাবিক কারণেই আমাদের বিস্মিত করে। ভাষা, কল্পনা কিংবা ষ্টাইলের জটিলতাপূর্ণ বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষ্য করেই বোধ হয় সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার কুমুদরঞ্জনের কাব্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

'এই কাব্যগুলির রসে কোন রং নাই, মশলা নাই—ইহা শরবতও নয়, একেবারে ডাবের জল।'

এমন কি, আশ্চর্য হতে হয় যে ভাষা সম্বন্ধেও কবি যত্নবান নন।

> 'তিনি যুগ থেকে একেবারে পিছিয়ে আছেন। আত্মরত জনতার মধ্যে একা, যুগের কলকোলাহলের নিত্য আন্দোলনের মধ্যেও আত্মসুরের একতারাটি নিয়েই তিনি আনন্দিত।'

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, কবির 'এ সুপ্তি পলায়নজাত নয়'। এই

ধ্যানরাজ্য স্বয়ং কবিরই সৃষ্টি। ওদেশের 'দেবশিশু' নামে পরিচিত 'শেলী'ও ঠিক এই রকম এক পৃথক জগতের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক কবিদের তুলনায় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর জগতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অধিবাসী। কিন্তু এই কারণে যদি শেলীকে 'Escapist' বলে অভিহিত করা হয়, তাহলে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হবে। কুমুদরঞ্জনের জগৎও শেলীর ন্যায় সৃষ্ট তাঁর একার জগৎ। সে জগতের অধিবাসী তিনি একা। সেইজন্যে সমসাময়িক কবিগণ থেকে তিনি পৃথক, তিনি নিঃসঙ্গ, একা। কিন্তু এই কারণে তাঁকে যদি Escapist বলা হয়, তাহলে কুমুদরঞ্জনের প্রতি কেবলমাত্র অবিচার করা হবে না, তাঁকে ভুল বোঝা হবে। কুমুদরঞ্জনের সৃষ্ট সেই স্বপ্নময় জগৎটার স্বরূপ সম্যক্-ভাবে না আলোচনা করলে তাঁর কাব্যকে যথার্থ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। সেইজন্যে আমরা তাঁর কাব্যজগৎটি ঠিকমত উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন ঃ

'সহজ কথা লিখতে মোরে কহ যে
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।

—কুমুদরঞ্জনের কাব্যে এই সহজ, সরল, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছেরই আধিপত্য। বাস্তবিক, সাধারণতঃ কবিগণ ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়বস্তুকে নিছক বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা একঘেয়েমি দূর করার উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু কুমুদরঞ্জন ক্ষুদ্রের মধ্যেই চিরন্তন আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করে থাকেন। পৃথিবীতে বহু ক্ষুদ্র জিনিষ আছে, অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা তাদের তুচ্ছ বলে অবহেলা করে থাকি। কিন্তু আমাদের কবি বলেন ঃ

ছোট যে হায় অনেক সময় বড়র দাবী দাবিয়ে চলে
রেখা টেনে ছোটোর গতি বড় যে জল গাবিয়ে চলে।

অতি বড় তুচ্ছ যা তাই ভালোবাসি আমরা সবাই,
ভুলায় বড়র অট্টহাসি ছোটর কণা নয়ন জলে।

সেই জন্যেই দেখি যে, কবির বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্রের প্রতিই একান্ত অনুরাগ। শুধু অনুরাগ নয়, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছের বর্ণনায় তিনি উত্তীর্ণ। অসংখ্য কবিতায় কবির তুচ্ছের প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কবি বলেন ঃ

মহামায়ায় যতই মানাক সিংহ এবং সিংহাসনে,
রামপ্রসাদের বেড়ার ধারে দেখেই যে হয় হিংসা মনে।

যত অবজ্ঞাত মানুষ, নগণ্য জীবজন্তু, বৃক্ষলতা সবই তাঁর রচনায় গৌরবের আসন লাভ করেছে। ক্ষুদ্রের মধ্যেও তিনি সর্বশক্তিমানের অমর স্পর্শ অনুভব করেছেন। তাই ক্ষুদ্র তাঁর কাছে অবহেলার উপযোগী তুচ্ছ বস্তুমাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও তুচ্ছের বন্দনা দেখা গেছে। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে তার পার্থক্য হল যে, বিশ্বকবির কাব্যে ক্ষুদ্রের মাধ্যমে বৃহৎ এসে ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সীমার মধ্যে সন্ধান পেয়েছেন অসীমের। কিন্তু কুমুদরঞ্জন ক্ষুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্রকেই উপলব্ধি করেছেন। সীমাকে কেন্দ্র করে অসীমের অভিমুখে যাত্রা করতে কবি সমর্থ হন নি, চেষ্টা ও করেন নি। কিন্তু তাই বলে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছকে তিনি কেবলমাত্র তুচ্ছ করেই রাখেন নি, তার মধ্যেও যে মহত্ত্ব থাকতে পারে—তা তিনি দেখিয়েছেন। 'মজুরের মমতা' এমনই একটি কবিতা যেখানে সামান্য মানুষের অসামান্য অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে—

পাষাণের মুখে আছে এত যে বাণী
আমি তো পাথর ভাঙি তাহা কি জানি।
ভাঙিতে ভাঙিতে আজ মিলিল খুঁজি
মা ছেলে পাষাণে ক্ষোদা সজীব বুঝি।

দুখিনী জননী তার হস্তে ছড়ি
বালক চলেছে তার হাতটি ধরি।
ভাঙিতে গিয়াই আহা জননী পানে—
পড়িল আমার আঁখি বাজিল প্রাণে।

আবার 'ভক্তির যুক্তি' শীর্ষক কবিতায় সামান্য একজন কৃষক, দুনিয়ার মালিক কে তার সহজ সমাধান করে দিয়েছে তার সহজ সরল বুদ্ধি দিয়ে এবং তাতেই সে অসামান্য হয়ে উঠেছে। কৃষক বলেছে :

জগৎ জননী মানা হতো যদি
দোপাটী পেত কি ফোঁটা?
গোলাপ পেত কি রাঙা চেলী
তার কদলী গরদ গোটা?
ময়ূর পেত কি ময়ূরকণ্ঠী
রেশমী পোশাক টিয়া?
ঝুঁটি কোথা পেত ছোট বুলবুলি
বাঁধা লাল ফিতা দিয়া?
ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারে
পারে যে সোহাগ দিতে—
কাজলে সাজাতে পারে টিপ দিয়ে,
দেখিনি তো হেন পিতে।

সুতরাং ধরার কর্তা জগদীশ্বর না হয়ে শ্যামা মা তথা জগন্মাতা হয়েছেন। 'নিষ্কর্মা' কবিতায় কবি পাড়ার অবহেলিত যুবকদের প্রতি তাঁর অন্তরের অনুরাগ ও স্নেহ প্রকাশ করে বলেছেন :

কেবল পরের কাজ করে যায়
অকেজো তাই সবাই বলে,
স্মরি তাদের গুণের কথা,
ভাসি আমি নয়ন জলে।

কুমুদরঞ্জনের এই তুচ্ছের প্রতি, নগণ্যের প্রতি অনুরাগের মধ্যে সমালোচক মোহিতলাল বাংলার কালচারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন।

বাংলার Wordsworth কবি কুমুদরঞ্জনকে বলা চলে 'he is a lover of nature'—প্রকৃতিপ্রেমিক কুমুদরঞ্জন। কবির এই প্রকৃতিপ্রেম স্বতঃস্ফূর্ত, নেহাৎ কবিকল্পনা বা fancy নয়। কবি Wordsworthএর মতই পল্লীর মধ্যে তিনি এক জীবন্ত সত্তাকে অনুভব করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কুমুদরঞ্জনের শেলীর ন্যায় এক স্বপ্নময় জগৎ আছে। শেলীর জগৎ রচিত হয়েছিল তাঁর নিজস্ব কল্পনায়—যে জগতে দুঃখ বলে কিছু ছিল না, চিরন্তন যৌবনের অধিকারী সকলে, সেখানে একটা রোমান্টিক পরিবেশ সদা-সর্বদাই বিরাজমান। তেমনই কুমুদরঞ্জনের জগৎ পল্লীকে কেন্দ্র করে রচিত। যে জগতে দোয়েল-শ্যামার মিষ্টতানে প্রাণ করে মাতোয়ারা, পল্লীর অতি সাধারণ মানুষের যেখানে বাস, শহরের চীৎকার বা জন-কোলাহলের লেশমাত্র সেখানে নেই।

কবির প্রকৃতি-প্রেম সহজ, সরল,স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। কবির ভাষায়ঃ

তোমারে যে আমি ভালবাসিয়াছি
কাব্য পড়িয়া নহে ;
নহেক' শ্যামল স্নেহের লাগিয়া
অন্যে যে কথা কহে।

কিংবা কবি যখন পল্লীর উদ্দেশে বলেনঃ

তুমি মোর গয়া, তুমি মোর কাশী,
সকল তীর্থ মিলিয়াছে আসি—
একদিকে তুমি 'ভ্রমরা' আমার
আর দিকে কালিদহ।

—তখন কবি কেবলমাত্র কাব্য করেই বলেন না, তিনি আন্তরিকতার সঙ্গেই বলেন ঃ

পাকা পথে চলা মোর কভু কি মানায়
চোখে জল ভরে ওঠে কানায় কানায়

প্রকৃতই, শহরে তিনি নিজেকে অসহায় বোধ করে থাকেন, অপরপক্ষে পল্লীতে তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে থাকেন। মাতৃক্রোড় সন্তানের নিকট যেমন সর্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং আরামপ্রদ স্থান, আমাদের কবির কাছে পল্লীজননীর ক্রোড়ও তদনুরূপ। মোহিতলালকে অনুসরণ করে আমরাও বলতে পারি, 'জলের সঙ্গে মাছের যে সম্বন্ধ, পল্লীর সহিত কুমুদরঞ্জনের সম্বন্ধ সেইরূপ।'

ইতিপূর্বে কুমুদকাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর ঈশ্বরপ্রীতি। কবি কুমুদরঞ্জন তাই ভক্তকবি। তাঁর ভক্তি কেবলমাত্র উপাস্য দেবতার প্রতিই সীমাবদ্ধ নয়—তাঁর ভক্তি সৎ, মহৎ, বৃহৎ, পবিত্র ও সর্বপ্রকার সৌন্দর্যের প্রতি। এককথায় তিনি যেমন বিশ্বস্রষ্টার ভক্ত, তেমনি ভক্ত তাঁর সৃষ্টির। সৃষ্টির প্রতিটি জীব, প্রতিটি ধূলিকণারমধ্যেই কবি অনন্ত সৌন্দর্যের অধীশ্বর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন। সামান্য শুঁয়োপোকার প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যেও কবি সেই অনন্ত করুণাময় ভগবানকে উপলব্ধি করে থাকেন—

ক্ষুদ্র তুচ্ছ পোকাটিরও প্রতি যাঁহার
করুণা হেন,
একই জীবনে দিব্য জীবন মানুষ
পাবে না কেন ?

'চকোর' কবিতার ন্যায় বহু কবিতায় কবির প্রেমাতুর সাধকচিত্তটি

অতি সহজে ধরা পড়ে গেছে। চকোর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি বললেন :

বুঝি তাঁরি কাছে যাবার লাগি এ-পাখা,
কণ্ঠের কাজ কেবল তাঁহাকে ডাকা।

এমন কি কবি স্বীয় কাব্য সাধনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর 'কবির সুখ' শীর্ষক কবিতায় বললেন :

কোন ধন মান পাইবার লাগি ঝঙ্কারে
পিক পাপিয়া ?
কি পায় সাধুরা গিরি-গহবরে কঠোর
জীবন যাপিয়া।
চিন্তামণির ধনে ধনী যারা তারা কি
মুক্তা মণি চায়
বিস্ময়ে দেখে বিশ্বরূপ যে নিতি প্রতি
অনু কণিকায়।
আমি সে সুখের সেই তৃপ্তির আর সে
প্রেমের ভিখারী।
আলোক মাগি যে আতপ মাগি যে সেই
হোমানল শিখারই।

কবি কুমুদরঞ্জন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। কিন্তু তাই বলে বৈষ্ণবের গোঁড়ামি বলতে যা বোঝায়, তা তাঁর কাব্যে লেশমাত্র স্থান পায় নি। 'শাক্ত' শীর্ষক কবিতায় কবি বললেন :

চামুণ্ডার ভীম তাণ্ডবেতে শাক্ত মোরা
হর্ষে ভাসি,
মা যে মোদের দয়াময়ী, মা যে মোদের
সর্বনাশী।

আবার 'অঘোরপন্থী' কবিতায় কবি দেবাদিদেব মহাদেবের ভক্তদের উদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। কিন্তু তবু বলতে হয় যে, কবি 'বৈষ্ণব' কবিতায় যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনটি অন্য ধর্মের বিষয়ে লেখা কবিতায় নন। 'বৈষ্ণব' শীর্ষক কবিতায় কবি তাঁর ইষ্টদেবতা প্রসঙ্গে বলেছেন:

মোদের হরি বংশীধারী,
মোদের হরি মাখনচোরা,
যুগল রূপের উপাসী যে,
পিপাসী যে রসের মোরা।

প্রফুল্ল কি ট্রাজেডি ?

'প্রফুল্ল' নাটকটি গিরিশচন্দ্রের একখানি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় সামাজিক নাটক। এই নাটকের নায়ক যোগেশ। তাঁর বহু পরিশ্রমে গঠিত শান্তির ও সুখের সংসার অকস্মাৎ কিরূপে ভেঙ্গে গেল, তারই করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই নাটকখানিতে। সমালোচক মহলে নাটকটি আলোড়নের সৃষ্টি করেছে—বিশেষতঃ এর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে। এক শ্রেণীর সমালোচক নাটকখানিকে ট্রাজেডি বলে স্বীকার করে, নানাবিধ যুক্তিপ্রয়োগে তাঁদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। আবার অপর আর এক শ্রেণীর সমালোচক নাটকখানির নানাবিধ ত্রুটি প্রদর্শন করে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, এটি ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। আবার ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ কয়েকজন সমালোচক নাটকখানির ট্রাজেডিত্ব স্বীকার করলেও এটিকে প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত করতে অস্বীকৃত হয়েছেন। এখন আমাদের বিচার্য বিষয়—'প্রফুল্ল'কে সত্যই ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা অথবা এর ট্রাজেডিত্ব স্বীকার করলেও এটি প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডি কি না। কিন্তু এ বিচার করার পূর্বে প্রয়োজন ট্রাজেডি বলতে আমরা সাধারণতঃ কি বুঝি এবং নাটককে কখন আমরা ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত করি সে সম্বন্ধে এক সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করা।

ট্রাজেডি বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি অলঙ্ঘ্য দুর্ভাগ্যের প্রতিরোধের জন্য প্রাণান্তকর প্রয়াস, এবং অবশেষে তাতে অকৃত-কার্যতা। ট্রাজেডি নাটকের নায়ক এই অনিবার্য দুর্ভাগ্য প্রতিরোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে অবশেষে তা রোধ করতে অসমর্থ হন। ব্যর্থ হলেও কিন্তু এই প্রতিরোধের চেষ্টার মধ্যে প্রকাশিত হয়

নায়কের অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং মহিমা। বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও মহিমামণ্ডিত নায়কের পতনের জন্য আমরা অন্তরে দুঃখ অনুভব করে থাকি। Dixon সাহেব তাঁর সুবিখ্যাত 'Tragedy' গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন: "it is however undifferentiated the characters, if the situation stirs in us the extremes of pity and alarm"—লক্ষণীয় যে 'extremes of Pity and alarm' উদ্রিক্ত করাই ট্রাজেডির উদ্দেশ্য এবং নায়কের মাধ্যমেই এই Pity এবং alarm উদ্রিক্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ট্রাজেডির নায়কই যে ট্রাজেডির মুল, সে বিষয়টি পরিস্ফুট হল। এই কারণে ট্রাজেডির বিচারে নায়ক চরিত্রকেই মুখ্য আলোচ্য বিষয় করা হয়ে থাকে। এখন 'প্রফুল্ল' নাটকের নায়ক যোগেশের চরিত্র আলোচনার পুর্বে দেখা প্রয়োজন যে 'ট্রাজিক হিরো' সাধারণতঃ কিরূপ হয়ে থাকেন। Aristotle ট্রাজিক হিরোর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন: "He falls from a position of lofty emminence and the disaster that wrecks his life may be traced not to deliberate wickedness, but to so great error or frailty"—অর্থাৎ ট্রাজেডির নায়কেরই কোন মারাত্মক ভ্রান্তি বা ত্রুটি তাঁকে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির অবস্থা থেকে দুঃখময় অবস্থায় পতিত করায়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে ট্রাজিক হিরোর এরূপ সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে। অন্তর্নিহিত ত্রুটি ব্যতীত কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার প্রভাবেও যে নায়ক চরিত্রের ট্রাজিক পরিণতি হতে পারে, তা বর্তমান কালের একাধিক প্রখ্যাত পাশ্চাত্য নাটকে দেখান হয়েছে। এবং এই প্রকারের ট্রাজেডিকেই নাট্য সমালোচকেরা 'Tragedy of incident' আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। অপর পক্ষে যে নাটকে নায়কের চরিত্রেই ট্রাজেডির বীজ নিহিত থাকতে দেখা যায়, তাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'tragedy of character'

নামে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর দৃষ্টান্ত Shakespeare এর 'ম্যাকবেথ', 'ওথেলো' ইত্যাদি নাটক। এক্ষণে উল্লেখযোগ্য যে, বহু সমালোচক 'প্রফুল্ল' নাটকের ট্রাজেডিত্ব বিচার কালে তাঁদের দৃষ্টি প্রধানতঃ পূর্ব প্রচলিত ট্রাজেডির লক্ষণের প্রতিই নিবদ্ধ রেখেছেন। অর্থাৎ 'tragedy of incident' এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ না করে তাঁরা 'tragedy of Character' এর প্রতিই বিশেষভাবে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে নাটকখানির সমালোচনা করে থাকেন। সুতরাং তাঁরা 'প্রফুল্ল' নাটকের ট্রাজেডি বিচারে যোগেশের চরিত্রগত ত্রুটিকেই মুখ্য আলোচ্য বিষয় রূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 'প্রফুল্ল' নাটকটি 'tragedy of incident'এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অবশ্য 'tragedy of Character'এর নিদর্শন হিসাবেও নাটকটিকে একেবারে পরিত্যাগ করা চলবেনা। অর্থাৎ 'tragedy of incident' এবং 'tragedy of Character'—এই তু'য়ের দৃষ্টিতেই 'প্রফুল্ল' নাটকের বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমে 'tragedy of Character' এর ধারা অনুসরণে নাটকখানির আলোচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্বভাবতঃই যোগেশের চরিত্রের বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

অধ্যাপক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ নাট্য সমালোচকগণ যোগেশ চরিত্রটিকে নিষ্ক্রিয়তা দোষে দুষ্ট বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অজিতবাবুর ভাষায়, "যোগেশের সক্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চূর্ণ হইয়াছে এবং সেই চূর্ণব্যক্তিত্ব ক্লীবের ন্যায় রমেশের ষড়যন্ত্রজালে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যোগেশের চরিত্রের আর যাহা কিছু বাকি থাকিল তাহাতে রহিয়াছে কুৎসিত মাতলামি, কদর্য নিষ্ঠুরতা ও নিষ্ক্রিয় দুঃখবিলাস। এতবড় একজন সচেষ্ট, সক্ষম পুরুষ হঠাৎ এরূপ একটি নিশ্চেষ্ট জড়পিণ্ডে পরিণত হইলেন এবং তাহাও শুধু ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার জন্য! ইহা

আকস্মিক পক্ষাঘাত, ট্রাজেডি নহে।”—অর্থাৎ যেহেতু যোগেশ তাঁর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন নি, সেইহেতু অজিতবাবু এই নাটকটিকে ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত করতে অস্বীকার করেছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও অজিতবাবুর ন্যায়ই যোগেশ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, “যোগেশের সাংসারিক দুর্ভাগ্যের সূচনা হইতেই কাহিনীর উন্মেষ এবং এই দুর্ভাগ্যের পূর্ণতার মধ্যেই ইহার পরিসমাপ্তি—ইহাতে কোন দ্বন্দ্ব নাই, অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিবার কোনও প্রয়াস নাই—নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেওয়াই ইহার বৈশিষ্ট্য।”—অতএব তাঁর অভিমত, “তাঁহার শোচনীয় পরিণতির জন্য যোগেশ কতদূর সহানুভূতি পাইতে পারেন, তাহাও বিবেচ্য।” ‘প্রফুল্ল’ নাটকের বিয়োগান্তক পরিণতি কার্যকরী হ'বার পক্ষে আর একটি প্রধান অন্তরায়—যোগেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আশুবাবু বলেছেন, “তাঁহার জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির অংশ নাট্যকাহিনীর পূর্ববর্তী এবং কেবলমাত্র যোগেশের মুখের কথার দ্বারাই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে—প্রকৃত নাট্যিক দৃশ্যের ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ পায় নাই। ‘আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল’ ইহা যোগেশের মুখের কথা, সাজান বাগানটি আমরা চোখে দেখিতে পাইলাম না বলিয়া ইহা যে কেমন করিয়া শুকাইয়া গেল তাহাও প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারিলাম না—ইহার কেবলমাত্র শুষ্ক দিকটাই আমরা গোড়া হইতে দেখিলাম—এই কারণেই কাহিনীর বিয়োগান্তক ফল দর্শকের উপর কার্য্যকর হইতে পারে না।”—অর্থাৎ যোগেশকে নাট্যকার Passive রূপে চিত্রিত করেছেন এই হল আশুবাবুর অভিযোগ। এখন এই সকল অভিযোগ বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

ট্রাজেডির নায়ক সম্বন্ধে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ট্রাজেডির নায়ককে

অবশ্যই উচ্চব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহান পুরুষ হতে হবে। কিন্তু আধুনিক কালে এই প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমালোচক Dixon সাহেব তাঁর বহুখ্যাত "Tragedy" গ্রন্থে Tragedy নাটকের নায়কের যোগ্যতা সম্বন্ধে আপন অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেনঃ "Good in some sense the hero of tragedy must be"— বিচারের এই মাপকাঠিতে যোগেশ চরিত্র নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হওয়ার দাবী রাখে। এখন তাঁর সম্বন্ধে যে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

নাটকের প্রথমেই যোগেশকে যেরূপভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের কঠিন পরিশ্রমে তাঁর সুখের ও সোনার সংসারকে দাঁড় করিয়েছেন। যোগেশের ভাষায় "দুটি অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি করে চালিয়ে এসেছি; বাবা মারা গেলেন, মাকে নিয়ে দুটি অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধরে খোলার ঘর ভাড়া করে রইলুম। সে একদিন গেছে, এখন ঈশ্বর ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও করেছি, খাবারও সংস্থান করেছি।" দুটি ভাইয়ের মধ্যে রমেশ এটর্ণি হয়েছে, এবং বলাবাহুল্য তাও যোগেশেরই প্রচেষ্টায়। কিন্তু ছোটভাই সুরেশকে তিনি মানুষ করতে সক্ষম হননি। এর জন্য তাঁর অসীম দুঃখ। যাইহোক ত্রিশ বৎসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর যোগেশ এখন দেহে এবং মনে বড়ই ক্লান্ত। এখন তিনি পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি লাভ করতে ইচ্ছুক। সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তিনি ভাগ করে দিতে চলেছেন ভায়েদের মধ্যে। এরূপ অবস্থায় আমরা যোগেশকে লাভ করেছি। মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, সত্যনিষ্ঠ এবং সহৃদয় ব্যক্তিরূপেই আমরা নাটকের প্রারম্ভে তাঁর সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু তাঁর এই অবসর গ্রহণের মুখে বাধ সাধল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার সংবাদ। এই ব্যাঙ্কেই তাঁর উপার্জনের এক বৃহৎ অংশ ছিল জমা। সুতরাং অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনার সংবাদে যোগেশ অত্যন্ত মুহ্যমান ও

বিচলিত হয়ে পড়লেন। যে সময়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তাতে স্বভাবতঃই যোগেশ অত্যন্ত Shocked হয়েছেন এবং এই দুর্ঘটনার মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছে যোগেশের ট্রাজেডি। হা-হুতাশ করে যোগেশকে বলতে দেখা গেছে, "ত্রিশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় রোজগার করেছি, গেল, একদিনে গেল, ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল।" এরপর এই নিদারুণ আঘাতকে ভোলবার জন্যে যোগেশ অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান করতে শুরু করেছেন আর এই মদ্যপানের পরিমাণকে বৃদ্ধি করে যোগেশের ট্রাজেডিকে ত্বরায় আনতে সাহায্য করেছে রমেশ। দুঃখের মধ্যেও যোগেশের সান্ত্বনা ছিল যে তিনি কখনও সততা পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর ভাষায়, "আমার সর্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা করে বলতে পারি, কখনো প্রবঞ্চনার দিক দিয়েও চলিনি।" কিন্তু এই সান্ত্বনার মূলেও কঠিন কশাঘাত হেনেছে রমেশের বিশ্বাসঘাতকতা। রমেশের বিশ্বাসঘাতকতায় অবশেষে যোগেশকে প্রবঞ্চকই হতে হয়েছে। যোগেশ সকল কিছু বুঝেও নির্বিকার থেকেছেন এবং এইতেই ট্রাজেডির মহিমা প্রকাশিত হয়েছে।

এটা ঠিক যে, যোগেশ ইচ্ছা করলেই এই সকল প্রতিকূলতার বিরোধিতা করতে পারতেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে একের পর এক আঘাতে এবং পুঞ্জীভূত অভিমানে তাঁর এ সবের বিরুদ্ধাচরণ করার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। Shakespeare এর King Lear যদি কন্যাদ্বয়ের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবিধানের জন্য বহিঃশক্তির আশ্রয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন, তবে তাঁর উন্মত্ত এবং অসহায় অবস্থার জন্য যে সহানুভূতি ও চোখের জল পাঠকবর্গের কাছ থেকে এ যাবৎ লাভ করে আসছিলেন, তা লাভে অসমর্থ হতেন। ঐ অবস্থায় Lear এর উন্মত্ত এবং অসহায় অবস্থার উপস্থাপনাই শ্রেয়ঃ হয়েছে। যোগেশ প্রসঙ্গেও অনুরূপভাবে বলা চলে যে, তাঁর এই নিষ্ক্রিয়তা তাঁর

মানসিক আঘাতের গভীরতা, সুনাম-সুযশের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস পরায়ণতা প্রভৃতিকেই উজ্জ্বলরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে। একটির পর একটি আঘাতে যোগেশ নিজেকে মদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেছেন। মদ্যপানের মধ্যেই সান্ত্বনার সন্ধান করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের 'দান প্রতিদান' গল্পেও দেখা যায় শশিভূষণ, রাধামুকুন্দের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে অবগত হয়েও শেষ অবধি নির্বিকার হয়েই ছিলেন। এই নির্বিকল্পতার মধ্যেই শশিভূষণের ভ্রাতৃপ্রেম গভীরভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য এর পরিবর্তে শশিভূষণ যদি রাধামুকুন্দের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, তা হলে তাঁর চরিত্রের ঔদার্য ও মহত্ব বিনষ্ট হত। ন্যায়ের নিকট যা দণ্ডনীয়, ভালবাসার নিকট অধিকাংশ সময়েই তার পরিসমাপ্তি ঘটে ক্ষমা এবং অভিমানের মধ্য দিয়ে। যোগেশও রমেশের বিশ্বাস-ঘাতকতা সম্বন্ধে অবহিত হয়েও নিষ্ক্রিয় থেকেছেন পুত্রাধিক রমেশের প্রতি অভিমানে।

অজিতবাবু যোগেশের ট্রাজেডির কারণ সুরাপান বলে মনে করেছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত এই যে, মদ্যপান যোগেশের ট্রাজেডির কারণ নয়, পরিণাম। যদিও যোগেশকে প্রথমাবধি মদ্যপ রূপেই দেখা গেছে, তবুও স্বীকার করতে হয় যে মদ্যপান তাঁর ট্রাজেডির কারণ নয়। স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় যোগেশের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, তাঁর সুনাম-সুযশের প্রতি আকাঙ্ক্ষাকেই তাঁর ট্রাজেডির কারণ বলে মনে করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোগেশের ট্রাজেডির কারণ হিসাবে কয়েকটি কারণকেই অভিহিত করতে হয়। ব্যাঙ্ক ফেলই যোগেশের ট্রাজেডির মুখ্য কারণ এবং যে সময়ে এটি ফেল করেছে—দেহ ও মনে পরিশ্রান্ত যোগেশের সেই অবসর গ্রহণের অবস্থা, রমেশের বিশ্বাসঘাতকতা, যোগেশের প্রবঞ্চকরূপে দুর্নাম এবং সুরেশের চোর হওয়া—এই

সকল ঘটনাই (incidents) যোগেশের ট্রাজেডির সম্মিলিত কারণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বেই 'প্রফুল্ল'কে বিশেষভাবে 'tragedy of incident' এর পর্যায়ভুক্ত বলেই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

কিন্তু এও সত্য যে, 'প্রফুল্ল' নাটকের কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি এটিকে প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডির সম্মানলাভে বঞ্চিত করেছে। এই ত্রুটিগুলি হল যথাক্রমে—যোগেশের চরিত্রের দ্রুত পরিবর্তন, ভাব-ঐশ্বর্যের অভাব, কয়েকটি অতিরঞ্জিত ঘটনার সমাবেশ, রমেশের শঠতার অতি প্রকাশ, উৎকৃষ্ট ট্রাজিক রিলিফের (tragic relief) অভাব এবং সর্বোপরি নাটকের গঠন পারিপাট্যের দৈন্য।

বিগত দিনের একটি বিস্মৃত পত্রিকা

পৃথিবীর সব দেশেই সাহিত্য-চর্চা প্রধানতঃ পত্র-পত্রিকাকে অবলম্বন করেই হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য আমাদের বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বরং পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে যে উদ্যোগ আয়োজন এখানে দেখা গেছে বা আজও যায়, তা ভারতবর্ষের অন্যত্র বিরল। তবে অন্যসব কাজের মতই পত্রিকা প্রকাশের সময় যেরূপ উদ্যম লক্ষিত হয়, একাধিক সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর নানাবিধ কারণেই উদ্যোক্তাদের সে উৎসাহ উদ্দীপনা ক্রমেই নিঃশেষিত হতে থাকে। অবশেষে একদিন বহু সাধের এবং বহুস্মৃতিবিজড়িত পত্রিকার প্রকাশ চিরদিনের জন্য যায় বন্ধ হয়ে। আজ পর্যন্ত বাংলা দেশে এইভাবে কত পত্র-পত্রিকার যে আবির্ভাব এবং অকালমৃত্যু ঘটেছে, আজ আর তার কোন হিসেব মেলা ভার। বর্তমান রচনাটিও বিগত দিনের এমনই একটি পত্রিকার প্রসঙ্গে। স্বল্পকালীন স্থায়ী এই পত্রিকাটির নাম 'বেপরোয়া'।

'বেপরোয়া' তার চাল-চলন, বিষয়বস্তু—সব কিছুতেই একপ্রকার বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ১৩২৯ সালে—সে আজ থেকে প্রায় ৪৮/৪৯ বৎসর পূর্বেকার কথা। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় সম্ভবতঃ আশ্বিন মাসে। পত্রিকাটি ছিল ত্রৈ-মাসিক। সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য। ইনি ছিলেন কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন কবি বিজয় চন্দ্র মজুমদার, কলকাতা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং ডাক্তার তুলসী চরণ ভট্টাচার্য। এঁদের মধ্যে একমাত্র অশীতিপর বৃদ্ধ প্রখ্যাত

ডাক্তার তুলসীচরণ ভট্টাচার্যই জীবিত আছেন। তবে লেখকগোষ্ঠী কিংবা সম্পাদনায় যাঁদেরই নাম থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটির প্রাণস্বরূপ ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গরচনা ও ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী সদ্য পরলোকগত ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সুসাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী তাঁর 'স্মৃতিচিত্রণ' গ্রন্থে এঁর কথার উল্লেখ করেছেন। 'বনফুলে'র প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'অগ্নীশ্বরে'র ডাক্তার পিতাও ইনিই। পত্রিকাটির পরিকল্পনা তো বটেই, এমনকি এতে প্রকাশিত রচনার অধিকাংশই ছিল তাঁর। আর 'বেপরোয়া'র প্রতিটি ব্যঙ্গ চিত্রও ছিল এঁরই অঙ্কিত।

পত্রিকাটির প্রচ্ছদ তথা 'টাইটেল পেজ' তথাকথিত যতসব অমঙ্গলকর ও অশুভ বস্তুর চিত্রাবলীতে শোভিত হয়ে প্রকাশিত হত। এই সবের মধ্যে ছিল ফণি মনসার গাছ, সাপ, ব্যাঙ, শূন্য নৌকা, শূন্য কলসী, ঝাঁটা, কাঁকড়া আর শূন্য ডালে উপবিষ্ট কাক।

'বেপরোয়া' পত্রিকার বৈশিষ্ট্য কিংবা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল অন্যায় তথা সর্বপ্রকার কুসংস্কারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ ও ব্যঙ্গের কশাঘাত করা; আর সেই সঙ্গে গতানুগতিক মানসিকতার বিরোধিতা। আশ্বিন মাসে শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রকার পত্র-পত্রিকার পূজা সংখ্যা প্রকাশ একপ্রকার রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে বলা চলে। কিন্তু 'বেপরোয়া' এক্ষেত্রেও তার বেপরোয়া মনোভাবের পরিচয় অক্ষুন্ন রেখেছিল। এর পূজা-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল চৈত্র মাসে এবং তাও আবার শ্রীশ্রী৺ঘেঁটু রাজের পূজা উপলক্ষে! পূজা-সংখ্যায় যে 'আবাহন' প্রকাশিত হয়েছিল, তার থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

হে দেবাদিদেব, হে ঘেঁটো, একবার আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হও, আমরা তোমার আবাহন করি। তুমি মহান্, তুমি শক্তিমান,

আমরা তোমাকে নমস্কার করি। তোমার চরণ স্পর্শে বঙ্গদেশ আজ নবশোভা ধারণ করিয়াছে। আজ বসন্ত তাহার শাখা পল্লবে, বসন্ত তাহার ঘরে ঘরে।

*　　*　　*　　*

তুমি বঙ্গদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আমরা তোমাকে বন্দনা করি। এমন অন্তঃসার শূন্য। এমন মাথায় গোবর। আর সেই গোবরে জাগিতেছে শুধু কড়ি। তাও ভাল করিয়া জাগে নাই, জাগিলে গোবরটা চাপা পড়িত। তোমার পা থাকিলে একটু চরণামৃত খাইয়া ধন্য হইতাম। কিন্তু ও হাত, পা, কি আর রাখিয়াছ? ওগুলার যে disease atrophy হইয়াছে!

তুমি বেপরোয়ার অন্তর্যামী, আমরা তোমাকে ভজনা করি। এই বাংলাদেশে অনশন আছে, অর্ধাশন আছে, কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আরও কত কি আছে। সে দিকে তোমার দৃক্‌পাত নাই। তোমার নজর শুধু খোস পাঁচড়ার উপর। তুমি শুধু চুলকণা সারাও।

সুপ্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকেই আধুনিক সভ্যতার যা কিছু গর্বের, তার সবই নাকি বর্তমান ছিল— এই ধরণের একপ্রকার মানসিকতাকে কটাক্ষ করে লিখিত হয়েছিল 'ইলেকৃট্রিসিটি' নামক ব্যঙ্গাত্মক রচনাটি।

টেলিগ্রাফি প্রভৃতি লইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের গর্বের আর অবধি নাই। তাঁহারা মনে করেন তড়িৎকে তাঁহারাই বশে আনিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি অনাদিকাল হইতে এই ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফির প্রচলন ছিল না? এই সেদিন যশোহর জেলার একস্থান খনন করিতে করিতে এক পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকায় খানিকটা ছিন্ন তার পাওয়া গেল। ইহা হইতেই ত বুঝা যাইতেছে যে সেই প্রাচীন যুগেও আর্যগণ Telegraphy জানিতেন।

এমনকি শিখা রাখার সার্থকতা বিষয়ে তৎকালে অনেকের মনে যে সংস্কার ছিল, তাকে লক্ষ্য করে লেখক বলেছেন—

আমরা জানি দেহ তড়িতে পূর্ণ। এই দেহস্থিত তড়িৎ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া নিশ্চয়ই law of repulsion অনুসারে মস্তক ও পদ শরীরের এই দুই প্রান্তে চালিত হয়। পদ সংলগ্ন তড়িৎ ভূগর্ভে লুপ্ত হইয়া যায়। অবশিষ্ট থাকে মস্তকস্থ তড়িৎ। এই তড়িৎকে যদি খুব অল্প পরিসর স্থানে নিবদ্ধ করিতে পারা যায় তো ঐ তড়িতের Potential খুব বেশী হওয়ায় উহার কার্যকরী শক্তি অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তড়িৎ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন আর্যগণ একথা জানিতেন তাই তাঁহারা রাখিলেন টিকি। সমস্ত তড়িৎ টিকিতে সংহত হইল। কিন্তু এই টিকির ডগা যদি উর্ধ্বে ফর্‌ফর্‌ করিয়া উড়িতে থাকে তো তড়িৎ Point দিয়া আকাশে leak করিয়া যাইবে তাই তাঁহারা টিকিতে ফাঁস দিয়া তাহার ডগাটি মস্তকের দিকে ফিরাইয়া দিলেন; ফলে শিখায় নিবদ্ধ সমস্ত তড়িৎ প্রাণন শক্তিমূলক medulla oblongata, Spinal cord এর উপরিভাগ চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় পরিচালক স্নায়ুকেন্দ্রগুলির উপর নিঃশেষে ব্যয়িত হইল— সমস্ত ইন্দ্রিয় সতেজ হইয়া উঠিল। কিন্তু পদদেশে চালিত তাড়িৎ তো ভূপৃষ্ঠে সঞ্চারিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাই তাঁহারা বসিবার আসন করিলেন সব non-conductors—মৃগচর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম প্রভৃতি। কিছুই নষ্ট হইতে পারিল না।

ধর্মরক্ষার নামে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর কতকগুলি কুসংস্কারের অযথা প্রতিপালনকেও নানাভাবে ব্যঙ্গ করতে দেখা গেছে একাধিক রচনায়—গদ্যে ও পদ্যে। বলাবাহুল্য এখন থেকে প্রায় ৪৮।৪৯ বৎসর পূর্বেকার সমাজ ও সেই সমাজে ধর্মরক্ষার নামে যে কি রকম বাড়াবাড়ি ছিল, তা আজকের দিনে অনুমান করা যথেষ্ট কষ্টকর। সে সময়ে নিতান্ত অল্প বয়সের কন্যার বিবাহদানের কঠোর নিয়ম

ছিল প্রচলিত। এবং সেই নিয়মের অন্যথা করার অধিকার কারোর ছিল না। তাহলেই সমাজ চ্যুতির ভয়। সুতরাং কন্যার একটু বয়স হলেই পিতা-মাতাকে নিতান্ত দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করতে হত তার বিয়ের চিন্তায়। এবং অবশেষে কোন ক্রমে একজন পাত্র খাড়া করে তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে কন্যার পিতা-মাতা সামাজিক কর্তব্য পালনের দায় থেকে উদ্ধার হতেন। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই উপযুক্ত পাত্রের পরিবর্তে বয়োবৃদ্ধ রুগ্ন প্রভৃতিদের হাতেই কন্যাকে সম্প্রদান করতে হ'ত। 'কলির ফের' শীর্ষক একটি কবিতায় তৎকালীন প্রচলিত এই সামাজিক প্রথাকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। সমসাময়িক সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসাবেও কবিতাটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য—

বয়স হ'ল বছর বারো, এখনো আইবুড়ো !
পিতৃ পিতামহের বিপদ ঠাউরে, জ্যাঠা, খুড়ো
ছেড়ে দিলেন রাত্রে আহার, দিনের বেলা ঘুম
দাবার ছকে দৃষ্টি রেখে সবাই নিজ্ঝুম্ !
মেসো পিসে পড়লেন ব'সে হুঁকোতে মুখ জুবড়ে,
বিশুর মুখ ত কুঁচ্কে গেল, এবং গেল তুব্ড়ে
বেগুন পোড়ার মত, মহা দুর্ভাবনার আঁচে
সবাই বল্লে 'এবার বিশু আর বুঝি না বাঁচে।'
পাড়ার লোকে ডুক্‌রে উঠে বল্লে সবাই হায় !
ধর্ম গেল ! ধর্ম গেল ! জাত বুঝি ঐ যায় !!

চারদিকে ঘটকচূড়ামণিরা খোঁজ খবরে লেগে গেলেন। পাত্রের সন্ধানও নেহাৎ কম এলো না। তাদের মধ্যে কারো বয়স দশ, কারো বা নয়ের পিঠে আট, কারো নেই স্ত্রী, কারো বা চরস খেয়েই দিন কাটে। কিন্তু এরকম সবগুণের পাত্র সংগ্রহ করা সহজসাধ্য

নয়। কারণ বর পণের পরিমাণ বেশ কিছু। সুতরাং কন্যার পিতা ত—

পড়লেন শুয়ে দাওয়ার উপর, দিলেন হাল ছেড়ে।
এমন সময় নীলু ঘটক এলেন টিকি নেড়ে,
আন্‌লেন সাথে, সাত গাঁ খুঁজে, সস্তা দরে বর,
চেলির জোড়ে অঙ্গ ঢাকা অনঙ্গ সুন্দর,
চল্‌কো জুতোয় ঢুকিয়ে চরণ, নেংচে চলা রোগ,
আঙুল হীন দুই হাতে লাঠি বাগিয়ে, কর্ম-ভোগ।
নাকের স্থানে গর্ত,—কারণ, বল্‌তে দোষ কি আর ?
বরের ছিল কুষ্ঠ। তা রোগ নেই বা বল কার ?

* * * *

এক রকমে সম্প্রদানের কার্য হল ফতে !
প্রেমের বাঁধন নিবিড় হ'ল স্মৃতির বিধান মতে ;
আইবুড়ো নাম ঘুচ্‌লো কনের, মাথায় উঠলো সিঁদুর,
সতীত্বের আজ জয় জয়কার, মুখ উজ্জ্বল হিঁদুর।

'বঙ্গভাষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে গদ্য ও পদ্য রচনার উদ্দেশ্য বর্ণিত হতে দেখা গেছে। প্রথমেই গদ্য রচনার কয়েকটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

ভাষার পুষ্টি সাধন। এই পুষ্টি সাধনের উপায় পদের দৈর্ঘ্য ও গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি। পদের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি সংস্কৃত সমাসের সাহায্যেই হইয়া থাকে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির উপায় পর্যাপ্ত কালি, কলম ও কাগজ। এই জাতীয় গ্রন্থ সাধারণতঃ বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়া থাকে।

অর্থোপার্জন। অর্থোপার্জনের উপায় তুষ্টি সাধন। শিক্ষিতা মহিলা, বিদ্যালয়ের ছাত্র, সম্পন্ন জমিদার, প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি তুষ্ট

হইলে গ্রন্থকারের অর্থাগম হইয়া থাকে। পনের আনা উপন্যাস ও স্কুল পাঠ্য পুস্তকের শতকরা ৯৯'৯৭৩২ খানি এই জাতীয়······ ইত্যাদি।

পদ্য রচনার একাধিক উদ্দেশ্যের মধ্যে আছে 'যশোলাভ'।

যশোলাভ। যশোলাভের একটি উপায় মৃত্যু। সর্বদেশে ও সর্বকালে একথা সত্য। কবিগণ মৃত্যুর পরই যশের মুকুট পরিধান করিয়া থাকেন। জীবদ্দশায় ইঁহাদের অনেকের ভাগ্যেই শিরোভূষণ যদি কিছু জুটিয়া থাকে ত গাধারটুপি।

······আর একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন, রচনায় পয়ার বাহুল্য। ইহা না থাকিলে কোন কবিই অক্ষয় যশঃ অর্জন করিতে পারিবেন না। 'স্বপ্ন প্রয়াণে' পয়ার নাই বলিলেই হয়, উপরন্তু তাহার রচয়িতা জীবিত, এই কারণে তিনি একেবারে অখ্যাতনামা (পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে বলা প্রয়োজন যে, 'স্বপ্নপ্রয়াণ' বঙ্গভাষায় লিখিত একখানি পদ্য গ্রন্থ। 'Struggle for Existence' এবং 'Survival of the fittest' এই নিয়মের বশে এখানি কিছুকাল হইল লোপ পাইয়াছে এবং সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়া উঠিতেছে।)

গদ্য ও পদ্যের সাধারণ গুণ বিষয়ে বলা হয়েছে—

গদ্য ও পদ্যের একটি সাধারণ গুণ, অপঠিত মনোহারিত্ব। বিলাতী কবি সেক্‌সপীয়রে এই গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কালেজের অধ্যাপক হইতে ভবানন্দ বাবুর বাজার সরকার পর্যন্ত সকলেই বলিবে 'আহা! সেক্‌সপীয়রের মানব চরিত্র চিত্রণ নৈপুণ্য কি চমৎকার!' সেক্‌সপীয়রের কবিত্বে ইঁহারা সকলেই মুগ্ধ। কিন্তু এরূপ মুগ্ধ হইবার জন্য সেক্‌সপীয়র পড়িবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ······যাহা হউক এ পরচর্চায় আমাদের প্রয়োজন নাই। বঙ্গদেশেই কয়েকজন

ক্ষণজন্মা লেখকের যথেষ্ট অপঠিত মনোহারিত্ব আছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের লেখনীর অধিকাংশ অপ্রত্যক্ষ থাকিয়াও আবালবৃদ্ধ বনিতার হৃদয়-মনোরঞ্জন করিয়া থাকে।

গদ্য ও পদ্যের ক্ষেত্রে বর্জনীয় যে সকল দোষের উল্লেখ করেছেন লেখক, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অশ্লীলতা'।

অশ্লীলতা। অশ্লীলতার কোন সংজ্ঞা হইতে পারে না। উহা সহৃদয় হৃদয়-বেদ্য। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'চন্দ্রশেখর' অশ্লীল নহে, কিন্তু 'চোখের বালি' বা 'চরিত্রহীন' অতিশয় অশ্লীল। 'বিদ্যা-সুন্দর' অশ্লীল নহে। হইলে তাহার মুদ্রণ, সংমুদ্রণ পুনর্মুদ্রণ এতদিনে বন্ধ হইয়া যাইত, এবং অভিনয়ের সাহায্যে ঘরে ঘরে তাহার রসস্বরূপের উপাসনা হইত না। কারণ আর যাহাই হউক অশ্লীলতা আমরা কিছুতেই মার্জনা করিতে পারি না।

—বলা নিষ্প্রয়োজন যে, 'বঙ্গভাষা' শীর্ষক আলোচনাটিতে তৎকালীন পাঠকের রুচিবোধ ও বিচারবোধকেই তীব্রভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে। অর্থাৎ সমসাময়িক কালে প্রচলিত রুচি ও বিচারবোধের সুষ্ঠু পরিচয় দানের জন্য এ রচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

'বেপরোয়া'র প্রতিটি সংখ্যাতেই ধাঁধা বা 'ফাউ' নামে কয়েকটি করে প্রশ্নোত্তরমূলক রচনা প্রকাশিত হত। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ রচনাগুলিও ছিল তীব্র কটাক্ষপূর্ণ ও শ্লেষাত্মক। দু'একটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

(ক) কোজাগরী পূর্ণিমার দিন নারিকেল জল খাইলে লক্ষ্মী ঘরে অচলা হইয়া থাকেন; অথচ দেখা যাইতেছে ধর্মপ্রাণ ভারত দিন দিন দরিদ্র হইতেছে। ইহার কারণ কি?

উত্তর। ভারতবর্ষে নারিকেল গাছ কমিয়া যাইতেছে।

(খ) স্বর্গে যাইবার মনু, রঘুনন্দন, পদীপিসী প্রদর্শিত কতকগুলি পথ আছে, যথা, গ্রীষ্মকালে লিমনেড বরফ খাইও না; আট বৎসরের বিধবা কন্যাকে নির্জলা একাদশী করাও; স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইলে আর একবার টোপর মাথায় দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবে ঝঞ্ঝাট অনেক। কোনও সহজ পথ আছে কিনা?

উত্তর। মহাজন নির্দিষ্ট এক অতি সহজ পথ আছে। সংসারে যতকিছু দুষ্কর্ম আছে করিয়া বেড়াও, মৃত্যুকালে পরের অনিষ্ট চিন্তা করিতে করিতেও মর, কোন চিন্তা নাই, তবুও ড্যাং ড্যাং করিয়া স্বর্গে যাইবে যদি মৃত্যুর পর তোমার পুত্র বা পৃথিবীর আর যে কেহ গয়ায় ক্রোশব্যাপী গদাধরের পাদপদ্মে তোমার নাম করিয়া একটি পিণ্ড ফেলিয়া দেয়।

পরিশেষে 'বেপরোয়া' পত্রিকার যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না করলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তা হল এতে প্রকাশিত ব্যঙ্গ চিত্রাবলী। 'বেপরোয়া'র রচনা ও চিত্র উভয়ই শ্লেষাত্মক ও কটাক্ষপূর্ণ। বাস্তবিক, এর প্রতিটি চিত্রই এত অপূর্ব ও উপভোগ্য যে, সেই রেখাঙ্কিত চিত্রগুলিকে ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। মদের বোতল, গাঁজার কলকে ও আফিমসহ উপবিষ্ট, রুদ্রাক্ষের মালা ও আলখাল্লা পরিহিত 'সিদ্ধ পুরুষের চিত্র', কিংবা সমাজ সংরক্ষণের নামে দু'পায়ে সমাজদলনরত সমাজের নেতার চিত্র, অথবা 'কাব্য সমালোচনা' শীর্ষক চিত্রগুলি কার্টুন চিত্র হিসাবে সত্যই অপূর্ব সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে 'কাব্য সমালোচনা' শীর্ষক চিত্রটির বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সে সময়ে রবীন্দ্রকাব্যের সমালোচকেরা কাব্য সমালোচনার নামে কবির ব্যক্তি জীবনের সমালোচনাতেই অধিক লিপ্ত থাকতেন। বিশেষতঃ এমন সব অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করতেন, যা নাকি কবির কাব্যের সঙ্গে সম্পর্করহিত।

'কাব্য সমালোচনা' চিত্রটির শেষে মন্তব্য সংযোজিত হয়েছে : 'কাব্য উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট বিচার করিতে হইলে প্রথমে analyse করিয়া দেখা উচিত—কবি কখনও চাল্‌তার অম্বল খাইয়াছিলেন কিনা। যদি না খাইয়া থাকেন বুঝিতে হইবে তিনি অপদার্থ। অতএব তাঁহার লেখাও অপদার্থ।'

সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ এ চিত্রটি দেখে মুগ্ধ হয়ে পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছে নাকি পত্র দিয়েছিলেন। বাস্তবিক, 'বেপরোয়া'র কার্টুন চিত্রগুলি ছিল পত্রিকার সম্পদ স্বরূপ।

এই 'বেপরোয়া' বেপরোয়ার মত এসে অনুরূপভাবেই স্বল্পকাল পরেই অন্তর্হিত হল। তবে স্বল্পকালীন স্থায়ী হলেও বাংলার সাময়িক পত্রের ইতিহাসে (যদিও 'বেপরোয়া'কে অসাময়িক পত্র বলে পত্রিকার টাইটেল পেজে ছাপা হ'ত) এর যে একটা বিশেষ স্থান আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ ব্যঙ্গাত্মক পত্রিকা হিসাবে 'বেপরোয়া' সেকালে ছিল অনন্য ও অদ্বিতীয়। বললে সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হবেনা—আজও এর জুড়ি মেলা ভার!

মালিনী নাটকের নায়ক বিচার

সাহিত্যের সৃষ্টি মানুষের জীবনবোধ থেকে। বলাবাহুল্য যে এই জীবনবোধ সকলের সমান নয়। এই কারণেই সাহিত্য সমালোচনায় সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য লক্ষিত হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সমালোচক সাহিত্যের ব্যঞ্জনাকে ব্যাখ্যা করে থাকেন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে, আপন আপন মনন শক্তি অনুযায়ী।

'মালিনী' রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি অত্যন্ত বিতর্কমূলক নাটক। নাটকটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও যে পরিমাণে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাটকটি সম্বন্ধে সমালোচক মহলে সর্বাপেক্ষা অধিক মতদ্বৈততা লক্ষিত হয় নাটকটির নায়ক প্রসঙ্গে। বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারেনা। কারণ, নাটকের প্রকৃত নায়ক কে তা যথার্থরূপে নির্দ্ধারণ করতে না পারলে নাটকের নাটকীয়তা, রস, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি উপলব্ধির ক্ষেত্রে অনেকটা বাধার সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই বিতর্কমূলক প্রশ্নটি বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

সুপ্রিয় মালিনীকে প্রথম দেখেছে মন্দির প্রাঙ্গণে যেখানে ক্ষেমংকর, চারুদত্ত, সোমাচার্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ মালিনীর নির্বাসনের আলোচনায় ছিলেন রত। যে মুহূর্তে সুপ্রিয় মালিনীর সাক্ষাৎ লাভ করেছে, সেই মুহূর্তেই সে তার হৃদয় মালিনীর নিকট অর্পণ করে ফেলেছে। সুপ্রিয়র কল্পনাপ্রবণ মন তাকেই ধর্ম বলে বিশ্বাস করে, যা তার হৃদয়কে আলোড়িত করে। মালিনীকে দেখে সুপ্রিয়র হৃদয় দোলায়িত। সে মালিনীর ধর্মমতকে ভালবাসতে গিয়ে ভালবেসে ফেলেছে মানবী মালিনীকে। এরপর অতি দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে মালিনী নবধর্মের

প্রচারক থেকে সাধারণ মানবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই দৃশ্যের প্রথম থেকেই দেখা গেছে যে, মালিনী কেমন করে সুপ্রিয়র কাছে আত্মসমর্পণে রত। প্রথমেই সে সুপ্রিয়কে বলেছে :

কী শাস্ত্র দেখাব আনি !
তুমি যাহা নাহি জান, আমি কি তা জানি ?

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে মালিনীর এই বিনয়ী বক্তব্যের মধ্যে যে সুপ্রিয়র প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে, তা লক্ষ্য করা যায়। সুপ্রিয় যখন মালিনীকে অনুরোধ করে বলেছে :

জানিবার কিছু নাই, নাহি চাহি জ্ঞান।
সব শাস্ত্র পড়িয়াছি, করিয়াছি ধ্যান
শত তর্ক—শত মত। ভুলাও, ভুলাও
যত জানি সব জানা দূর করে দাও।
পথ আছে শত লক্ষ, শুধু আলো নাই।
ওগো দেবী জ্যোতির্ময়ী ! তাই আমি চাই
একটি আলোর রেখা উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হতে।

উত্তরে মালিনী স্বীয় দুর্বলতার কথা প্রকাশ করে সুপ্রিয়র সাহায্য প্রার্থনা করে বলেছে :

মনে হয়
বড়ো একাকিনী আমি, সহস্র সংশয়,
বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ,
নানা প্রাণী, দিব্যজ্ঞান ক্ষণ প্রভাবৎ
ক্ষণিকের তরে আসে। তুমি মহাজ্ঞানী
হবে কি সহায় মোর ?

এই বক্তব্যের মধ্যে মালিনীর পূর্বের সত্তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। যে মালিনী কিছু পূর্বে বলেছে :

> ....আজ আমি হয়েছি সবার
>
> অথবা,
>
> দেহ নাহি মোর, বাধা নাই,
>
> আমি যেন এ বিশ্বের প্রাণ।

কিন্তু এখন সে তার সেই অসীম ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। কারণ আর কিছুই নয়, সুপ্রিয়ের কাছে প্রাণ-মন সমর্পণ করে সে অন্তরে এবং বাইরে বড় দীন হয়ে পড়েছে। সুপ্রিয় মালিনীর পূর্বোক্ত প্রশ্নে বলেছে :

> বড় ভাগ্য মানি
>
> যদি চাহ মোরে।

এই প্রসঙ্গে মালিনীর উত্তর বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সে সুপ্রিয়কে বলেছে :

> —অকারণ অশ্রুজলে ভাসে
>
> দু'নয়ন কোন্ বেদনায়! অকস্মাৎ
>
> আপনার 'পরে যেন পড়ে দৃষ্টিপাত
>
> সহস্র লোকের মাঝে! সেই দুঃসময়ে
>
> তুমি মোর বন্ধু হবে? মন্ত্রগুরু হয়ে
>
> দিবে নবপ্রাণ?

এই বক্তব্যের দ্বারাই বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মালিনী সুপ্রিয়কে সমগ্র জীবনের বন্ধু তথা স্বামীরূপে পেতে চেয়েছে। এই প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক-অধ্যাপকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, "সুপ্রিয় মালিনীর নিকট বার্তার নবধর্মাদর্শের নিকট অভিভূতভাবে আত্ম-সমর্পণ করেছে। মালিনীও নিজেকে 'মহাধর্ম তরনীর বালিকা

কাণ্ডারী' বলে বর্ণনা করে নবধর্ম প্রতিষ্ঠায় সুপ্রিয়ের সহায়তা প্রার্থনা করেছেন। মালিনী সুপ্রিয়কে মন্ত্রগুরু বিবেচনা করছেন এবং অন্যদিকে সুপ্রিয় মালিনীর নিকট মন্ত্রশিষ্যের ন্যায় ব্যবহার করছেন।" কিন্তু আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে সুপ্রিয় মালিনীকে বলেছে তার জানবার কিছুই নেই। সকল শাস্ত্র সে ইতিমধ্যেই পাঠ করেছে। সুতরাং সুপ্রিয় আর যাই হোক সে যে মালিনীর মন্ত্রশিষ্য হতে চায়না এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এছাড়াও প্রেমের যা ধর্ম, তাও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়েছে মালিনী এবং সুপ্রিয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে। একে অন্যের কাছে নিজেকে তার সাহচর্য বিনা অত্যন্ত অসহায় মনে করেছে। সমালোচক-অধ্যাপক আরও বলেছেন, "কথায় কথায় মালিনী ক্ষেমংকরের প্রসঙ্গে আসলেন। ক্ষেমংকরের সংবাদ শুনতে মালিনী অতিশয় আগ্রহান্বিত হচ্ছেন।" —মালিনীর এই আগ্রহকে তিনি ক্ষেমংকরের প্রতি অনুরাগ বলে মনে করেছেন। কিন্তু মালিনী ক্ষেমংকরের কথা শোনার জন্য যেখানে আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তার ঠিক পুর্বের কথা বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে যে, মালিনীর এই আগ্রহ ক্ষেমংকরের প্রতি তার অনুরাগ নয়। মালিনী বলেছে ঃ

গৃহের বারতা সব, আত্মীয়ের মতো
সকলি প্রত্যক্ষ যেন জানিবারে পাই।

—অর্থাৎ মালিনী সুপ্রিয়র সকল কিছুর সঙ্গেই পরিচিত হতে চায়। এই হিসাবে ক্ষেমংকর যেহেতু সুপ্রিয়ের বন্ধু, সেই হেতু তার বিষয়ে সে জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। প্রেমিকা মালিনীর পক্ষে এতাদৃশ আচরণ যে যুক্তিসঙ্গত তা বেশ বোঝা যায়।

যে সকল সমালোচক ক্ষেমংকরকে মালিনীর প্রেমিক বলে মনে

করে থাকেন, তাঁরা বলেন যে, মালিনী যদি ক্ষেমংকরের অনুরাগী না হত, তাহলে সে সুপ্রিয়কে কখনই বলত না ঃ

হায়, কেন তুমি তারে
আসিতে দিলেনা হেথা মোর গৃহদ্বারে
সৈন্যসাথে ? এঘরে সে প্রবেশিত আসি
পূজ্য অতিথির মতো—সুচির প্রবাসী
ফিরিত স্বদেশে তার।

এর উত্তর হল এই যে, যেহেতু বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সুপ্রিয় বিবেকের দংশনে জ্বলছিল, সেইজন্যই মালিনী এই ধরণের সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ করেছে। মালিনীর এই বক্তব্য ক্ষেমংকরের প্রতি অনুরাগ পোষণ করেনা। সুপ্রিয়কে অনুশোচনার হাত থেকে পরিত্রাণ-লাভের পথের সন্ধান মাত্র দিয়েছে সে।

মালিনী সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সুপ্রিয়কে হত্যা করার পর ক্ষেমংকরকে যেহেতু সে ক্ষমা করতে বলেছে। সমালোচকদের মতে এর মাধ্যমেই ক্ষেমংকরের প্রতি মালিনীর অনুরাগ পুর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। যদি প্রকৃতই মালিনী সুপ্রিয়কে ভালবাসত, তাহলে তার হত্যাকারী ক্ষেমংকরকে সে কোন-মতেই ক্ষমা করার জন্য বলতে পারতনা। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী মহাশয় যথার্থই বলেছেন যে প্রথমতঃ মালিনী বৌদ্ধধর্মের যে অন্যতম প্রধান গুণ ক্ষমাধর্ম, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্ষেমংকর-কে ক্ষমা করার জন্য বলে থাকতে পারে। দ্বিতীয়তঃ প্রাণাধিক প্রিয় সুপ্রিয়কে হত্যা করে ক্ষেমংকর যে অত্যন্ত অনুতপ্ত হবে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ক্ষেমংকরের যদি মৃত্যুদণ্ড হয়, তাহলে বন্ধুহত্যার অনুশোচনার অনলে তাকে আর দগ্ধ হতে হবে না। সেই কারণেও মালিনী ক্ষেমংকরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আবেদন করে থাকতে পারে।

প্রশ্ন উঠেছে মালিনী ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করতে বলেই যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে তার কারণ কি? প্রকৃতই যদি সে ক্ষেমংকরকে ভালবেসে থাকে এবং তাকেই স্বামীরূপে লাভ করতে ইচ্ছা করে থাকে, তাহলে সুপ্রিয়র মৃত্যু তার সেই আশাকে বাস্তবায়িত করতে সহায়তাই করল। এতে মালিনীর দুঃখের কোন কারণই থাকতে পারেনা। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, যেহেতু সে সুপ্রিয়ের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, সেইহেতু তার মৃত্যুতে প্রাণে যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, তারই ফলে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে। অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য তাঁর 'রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থে মালিনী এবং সুপ্রিয় সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, "সুপ্রিয় ভক্তির পরীক্ষা দিয়েছে প্রাণ দিয়ে, মালিনী ধর্মের পরীক্ষা দিয়েছে প্রাণাধিক প্রিয় সুপ্রিয়ের হত্যাকারী ক্ষেমংকর-কে ক্ষমা করে।"—অর্থাৎ সাধন ভট্টাচার্য মহাশয় ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করার কারণ হিসাবে মালিনীর ধর্মবোধকে অভিহিত করেছেন। সে যাই হোক, তিনিও কিন্তু সুপ্রিয়কে মালিনীর 'প্রাণাধিকপ্রিয়' বলে অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সুপ্রিয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের পূর্বোক্ত ধারণাকেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন: "...... (মালিনী) তাহার পিতার কাছে অনুরোধ করিয়াছে: মহারাজ ক্ষম ক্ষেমংকরে এবং এই কথা বলিয়া সুপ্রিয়ের মৃত্যুতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে।"

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য, অনেক সমালোচক আবার এরূপ অভিমত পোষণ করে থাকেন যে, মালিনীর হৃদয় কারও প্রতিই ধাবিত হয়নি। অর্থাৎ তাঁরা মালিনীর সাধারণ মানবীয় প্রেমকে অস্বীকার করে থাকেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য বলে বোধ হয় না। স্বয়ং রবীন্দ্র নাথই 'মালিনী' নাটকের ভূমিকায় বলেছেন যে, এই নাটকের ভাবের অঙ্কুর আপনা আপনি দেখা দিয়েছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায়, আরও স্পষ্ট করে বললে দাঁড়ায়, "মানব প্রকৃতিকে

বঞ্চিত করিয়া তাহাকে ক্ষুধিত রাখিয়া, সেই শূন্যতার উপরে মহত্তর জীবনের বেদী রচনা করিতে গেলে অকস্মাৎ তাহা ধ্বসিয়া পড়ে, মালিনী নাটক হইতে এই ইঙ্গিতটি পাওয়া যায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর চিত্ত ক্ষুধিত ছিল বলিয়াই সে তপস্যায় শান্তি পায় নাই—তাহাকে রঘুর কন্যার স্নেহে আবদ্ধ হইয়া সংসারে ফিরিতে হইয়াছিল। মালিনীরও কি সেই একই ট্রাজেডি নয়? প্রথম অংশের মালিনী মানব প্রকৃতির দাবী এড়াইয়া নবধর্মের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছিল, নাটকের শেষ অংশে প্রকৃতি তাহার বলি সংগ্রহ করিয়াছে। সেই অপরাধে দেবী মালিনী কলঙ্কের গ্লানি মাথায় তুলিয়া মানবত্বের মধ্যে, এবং তাহা আদৌ গৌরবময় মানবত্ব নহে, আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইহাই মানব প্রকৃতির প্রতিশোধ।"

প্রৌঢ় ঋতুর ফসল[১] : আরোগ্য

রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কাব্যগুলির মধ্যে 'আরোগ্য' (১৯৪১) শীর্ষক গ্রন্থটি অন্যতম। কবি তেত্রিশটি কবিতা সম্বলিত এই কাব্য গ্রন্থটি তাঁর পরম স্নেহাস্পদ শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করকে উৎসর্গ করেন। কাব্যখানিতে অনুসৃত আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য, ছন্দ, ব্যবহৃত উপমা সর্বোপরি কবির বিদায়কালীন অনুভূতির প্রকাশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

কবির অন্তিম পর্বের অপরাপর রচনাগুলির ন্যায় 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলিও সকলপ্রকার অলংকার বর্জিত। কবি তাঁর বক্তব্য বিষয়কে নিরাভরণ রূপেই প্রকাশ করেছেন। তদুপরি উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলির মন্ত্রবৎসংহতি। তৃতীয় সংখ্যক কবিতাটিতে কবি বলেছেন :

মনে মনে ভাবিয়াছি, প্রাচীন যুগের
বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে।

বস্তুতঃ, কবির এই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকেনি। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলির আদ্যন্ত দৃঢ়, পিনদ্ধ এবং সংহত রূপ, বৈদিক মন্ত্রের সংহত রূপকেই বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। কবি স্বয়ং তাঁর স্বল্পভাষণ প্রসঙ্গে একস্থানে বলেছেন :

রোগপঙ্গু লেখনীর বিরল ভাষায়
ইঙ্গিতে পাঠায় কবি আশীর্বাদ তার।

১. স্বীয় কাব্যের ঋতু পরিবর্তন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'নবজাতকে'র (১৯৪০) সূচনায় বলেছেন, 'এরা বসন্তের ফুল নয়; এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তা হলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের রচনা।'

ত্রয়োদশ সংখ্যক কবিতাটিতে কবি বিগত যৌবনের রঙীন, উচ্ছল প্রেমানুভূতির সঙ্গে জীবন সায়াহ্নের স্নিগ্ধ প্রেমানুভূতির তুলনা করে বলেছেন :

ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে
নির্ঝরের প্রলোপ কল্লোলে,
... ...
আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্তব্ধতায়
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।

সুদীর্ঘ জীবন-পথ পরিক্রমা শেষে জীবন-সায়াহ্নে উপনীত কবিকে জীবনের লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশে ব্যাপৃত থাকতে দেখা গেছে ষোড়শ সংখ্যক কবিতাটিতে—

কী পেয়েছি প্রাপ্য যাহা, কী দিয়েছি যাহা
ছিল দেয়,
কী রয়েছে শেষের পাথেয়।

'আরোগ্য' গ্রন্থটির বেশ কয়েকটি কবিতাতেই কবিকে অতীত স্মৃতি-চারণায় মগ্ন দেখা গেছে। যৌবনকালে মানুষ ভবিষ্যৎ চিন্তায় থাকে বিভোর, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে মানুষকে অতীত স্মৃতিচারণায় মুখরিত হতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে কবির বক্তব্য :

পথে-চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে ;

আবার কখনও কবি বলেছেন :

মনে পড়ে কতদিন
ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা
কর্মহীন প্রৌঢ়-প্রভাতের
ছায়াতে আলোতে
আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া
ফেনায় ফেনায়।

জীবনের শেষপাদে উপনীত হয়ে কবি নিজেই একদা নিজের কবি-পরিচিতির ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।'[২] বাস্তবিক, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবির মানব প্রীতি ছিল অটুট। তাঁর শেষ পর্বের কাব্যগুলিতেও এই মানব প্রীতি প্রকাশিত। আলোচ্য কাব্যটিতে প্রকাশিত কবির মানবপ্রীতিও এক বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কবির ভাষায় :

সব কিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন।

প্রসঙ্গতঃ কবির মর্ত্যপ্রীতিও উল্লেখযোগ্য। জরাজীর্ণ এবং রোগগ্রস্ত কবির জীবনবিমুখতার পরিবর্তে আত্যন্তিক মর্তপ্রীতি প্রকাশিত হয়েছে 'আরোগ্যে'র অনেকগুলি কবিতাতেই। প্রথম কবিতাটি

---

২. শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় বিরচিত 'তীর্থঙ্কর'; রবীন্দ্রনাথের পত্রমর্মর ; পৃঃ ২৯১-২৯২ দ্রষ্টব্য।

থেকেই জগতের প্রতি কবির মমতামেদুর আবেগের পরিচয়টি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
...   .
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।

সদ্যরোগমুক্ত কবির জীবনের গতিবেগের মন্থরতা দু'একটি কবিতা ব্যতিরেকে কাব্যের প্রায় সব কয়টি কবিতার ছন্দেই প্রতিফলিত লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে ছন্দ কেবলমাত্র বক্তব্য বিষয়ের সার্থক বাহনেই পরিণত হয়নি, সেইসঙ্গে জরাজীর্ণ কবির জীবন-প্রবাহের প্রতীকেও পরিণত। তৃতীয় কবিতাটিতে লক্ষিত হয়, জীবনের মন্থরগতি কবির দৃষ্টিকেও প্রভাবিত করেছে:

শীতের মধ্যাহ্নতাপে তন্দ্রাতুর বেলা
চলেছে মন্থরগতি
শৈবালে দুর্বলস্রোত নদীর মতন।

অন্যত্রও কবি তাঁর জীবনের মন্থর গতিবেগ প্রসঙ্গে স্পষ্টতঃই বলেছেন:

অলস শয্যার পাশে জীবন মন্থরগতি চলে,
রচে শিল্প শৈবালের দলে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতায় কবির সকল প্রকার অনুভূতির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে মৃত্যু ভাবনা। রোগ এবং জরার আক্রমণে আক্রান্ত কবির দেহের শক্তি ও সামর্থ্য যতই মন্দীভূত হয়েছে, ততই তীব্রভাবে কবি অনুভব করেছেন মৃত্যুর শাশ্বত রূপকে—

প্রস্থানের অঙ্কে আজ এসেছি যেমনি
দীপশিখা ম্লান হয়ে এল,
ছায়াতে পড়িল ধরা এ খেলার মায়ার স্বরূপ,
শ্লথ হয়ে এল ধীরে
সুখ দুঃখ নাট্যসজ্জাগুলি।

কথনও বলেছেন ঃ

খ্যাতি নিন্দা পার হয়ে জীবনের এসেছি প্রদোষে,
বিদায়ের ঘাটে আছি বসে।

আবার কখনও বা বলেছেন :

ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বুছি এল,
বিদায়দিনের 'পরে আবরণ ফেলো
অপ্রগল্‌ভ সূর্যাস্ত-আভার ;

কবিতাগুলিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপমাগুলির মধ্যেও কবির বিদায়-কালীন বিষণ্ণতাটি পরিস্ফুট হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। 'নিঃস্ব প্রহর', 'পরিশ্রান্ত প্রদোষ', 'পাণ্ডুর নীলিমা', 'ছিন্নবৃন্ত', 'জীর্ণনীড়', ইত্যাদি পদগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ সংখ্যক কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবাল্য মাতৃস্নেহরসে বঞ্চিত বুভুক্ষু কবিচিত্ত, জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়ে মাতৃস্নেহের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে ঃ

বদ্ধঘরে কর্মক্ষুব্ধ সংসার বাহিরে
অশক্ত সে শিশুচিত্ত মা খুঁজিয়া ফিরে।

কবি কাব্যে তাঁর বিদায়ের পদধ্বনিকে প্রকাশ করেছেন সত্য এবং আসন্ন বিদায়ের সম্ভাবনায় কবিচিত্ত কিয়ৎপরিমাণে বিষণ্ণ এবং বিষাদ ভারাক্রান্তও বটে, কিন্তু এই বিষাদেই কবির বক্তব্য শেষ হয়ে যায়নি। কারণ কবি বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর করাল স্পর্শ শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'পরম আমি'র সঙ্গে যুক্ত করবে—

আমার হয়েছে অভিষেক,
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী ;
পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি

গুরুতর রোগভোগের পর রচিত 'আরোগ্য' কাব্যের একশ্রেণীর কবিতায় গতবল কবিকে তাঁর শুশ্রূষাকারী বিভিন্ন ব্যক্তিদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে। সামান্য সেবাও কবির কাছে অসামান্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। এবং এই সেবার মাধ্যমেই কবি মানুষের মধ্যেকার চিরন্তন দেবত্বের পরিচয় লাভে হয়েছিলেন ধন্য—

দিদিমণি—
অফুরান সান্ত্বনার খনি।
কোনো ক্লান্তি কোনো ক্লেশ
মুখে চিহ্ন দেয় নাই লেশ।
কোনো ভয় কোনো ঘৃণা কোনো কাজে কিছুমাত্র গ্লানি
সেবার মাধুর্যে ছায়া নাহি দেয় আনি।
এ অখণ্ড প্রসন্নতা ঘিরে তারে রয়েছে উজ্জ্বলি,
রচিতেছে শান্তির মণ্ডলী ;
ক্ষিপ্র হস্তক্ষেপে
চারিদিকে স্বস্তি দেয় ব্যেপে ;

আশ্বাসের বাণী সুমধুর
অবসাদ করি দেয় দূর।

অন্যত্র দেখা যায়—

বিশু দাদা—
দীর্ঘবপু, দৃঢ়বাহু, দুঃসহ কর্তব্যে নাহি বাধা,
বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চিত্ত তার
সর্বদেহে তৎপরতা করিছে বিস্তার।
তন্দ্রার আড়ালে
রোগ ক্লিষ্ট ক্লান্ত রাত্রিকালে
মূর্তিমান শক্তির জাগ্রত রূপ প্রাণে
বলিষ্ঠ আশ্বাস বহি আনে,

এমনকি সামান্য সঙ্গদানের জন্যও কবিকে 'সরোজদাদা'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে—

সরোজদাদার দিকে চাই—
সব তাতে রাজি দেখি, কাজকর্ম যেন কিছু নাই,
সময়ের ভাণ্ডারেতে দেওয়া নেই চাবি,
আমার মতন এই অক্ষমের দাবি
মেটাবার আছে তার অক্ষুন্ন উদার অবসর,
দিতে পারে অকৃপণ অক্লান্ত নির্ভর।

এইবার কাব্যটির নামকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। গুরুতর রোগ ভোগের পর সদ্য নিরাময় লাভের পরে রচিত বলে কাব্যটির নামকরণ হয়েছিল 'আরোগ্য,' আপাত দৃষ্টিতে অন্ততঃ এইরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষণীয়, অন্ততঃ দু'টি

কবিতায় 'আরোগ্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্নতর তাৎপর্যে। ষোড়শ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন ঃ

> জীবনের শেষ প্রান্তে যে প্রেম রয়েছে নিরবধি
> মোর কোনো অসম্মান তাহে ক্ষতচিহ্ন দেয় যদি,
> আমার মৃত্যুর হস্ত আরোগ্য আনিয়া দিক তারে,
> এ কথাই ভাবি বারে বারে।

—অর্থাৎ কবির অজ্ঞাতে কবিকৃত অসম্মান অথবা আঘাত তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে আরোগ্য লাভে সমর্থ হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যত্র কবি নারীর পরম স্নেহময় হস্তের সেবার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> তুমি নারী
> তাঁহার আপন সহকারী।
> উন্মুক্ত করিতে থাক আরোগ্যের পথ,
> নবীন করিতে থাক জীর্ণ যে জগৎ,

অর্থাৎ কেবলমাত্র রোগ যন্ত্রনাই নয়, জগতের সর্ববিধ দুঃখ-কষ্ট এবং আঘাত থেকে আরোগ্য লাভের জন্য স্নেহময়ী, করুণা স্বরূপিনী নারীর প্রয়োজনের অপরিহার্যতার কথাই বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, ইতিপূর্বে উল্লিখিত উনিশ সংখ্যক কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে কবিকে নারীর ক্লান্তিহীন সেবার সপ্রশংস উল্লেখ করতে দেখা গেছে। পরিশেষে, সমালোচকের মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলা যেতে পারে, 'ব্যাধিবিকারের এরূপ সূক্ষ্ম ও সত্য কাব্যরূপায়ণ, উহার বিভীষিকা, অসংলগ্ন চিন্তা, অসুস্থ মনের উদ্ভট, দুঃস্বপ্ন-ক্লিষ্ট অনুভূতির এরূপ আবেগময় ও শিল্প-সুমিত বর্ণনা বিশ্বসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী'।

বাংলা ঐতিহাসিক নাটক ঃ টডের 'রাজস্থান'

(১)

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় ঐতিহাসিক নাটক কিংবা উপন্যাসের উদ্ভবের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, মূলতঃ এর কারণ নিহিত ছিল তৎকালীন স্বাদেশিক চেতনায়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী সেদিন আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, নিজেদেরই প্রয়োজনে। প্রাচীন গ্রীক-রোমের ইতিহাস তাদের গৌরবময় কীর্তি গাথায় সমুজ্জ্বল। সেদিনের শিক্ষিত বাঙালীও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আমাদের দেশের অনুরূপ গৌরবময় ঐতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্রের অনুসন্ধানে। উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন পরাধীনতার গ্লানিময় পরিবেশে অতীতের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী এবং চরিত্রের উপস্থাপনায় দেশবাসীর স্বাদেশিক চেতনাকে জাগ্রত এবং পরিপুষ্ট করতে। এই প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতাদের অন্যতম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণনায় সে যুগের অধিকাংশ লেখকের মানসিকতা লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ

"হিন্দুমেলার পর হইতে আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"[১]

স্বদেশ-প্রেম প্রচারের মাধ্যমরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন গ্রহণ করেছিলেন নাটকের আঙ্গিক, অনুরূপভাবে একই আদর্শের দ্বারা

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ; পৃঃ ১৪১।

অনুপ্রাণিত তৎকালীন অধিকাংশ লেখকই নিজ নিজ প্রতিভা ও রুচিভেদে ভারতের প্রাচীন গৌরবগাথা প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের সহায়তা। কিন্তু সে সময়ে ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস তেমন সুলভ ছিল না। তাই পশ্চিম রাজস্থানের অন্তর্গত রাজ্যসমূহের তৎকালীন ইংরেজ রাজনৈতিক প্রতিনিধি জেম্‌স্ টড্ প্রণীত 'Annals and Antiquities of Rajasthan' সহজেই সেদিন ইতিহাস—সচেতন শিক্ষিত বাঙালীকে আকৃষ্ট করেছিল। বিশেষতঃ আমাদের দেশের মধ্যযুগের ইতিহাস পরাধীনতার ইতিহাস। মধ্যযুগের পরাধীনতার গ্লানিময় অধ্যায়ে একমাত্র বীর রাজপুতগণই নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতুলনীয় স্বাক্ষর রেখেছিল। তাই স্বাভাবিক কারণেই সেদিন অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন টডের গ্রন্থ থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহে। সুতরাং রাজস্থানের বিষয়বস্তু অবলম্বনে গ্রন্থাদি রচনায় উদ্বুদ্ধ হলেন সেকালের ছোট-বড় অনেক লেখকই। তন্মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দামোদর মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, রাজকৃষ্ণ রায়, হারাণচন্দ্র মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বসন্তকুমারী মিত্র, কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রমুখেরা উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনেকেই স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর সঙ্গে তৎকালীন প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ সরকারের বিরোধকে 'রাজস্থান' গ্রন্থে বর্ণিত মুঘল-রাজপুত দ্বন্দ্বের রূপকে প্রকাশ করেছেন। এজন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ব্যতীত ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের ইতিহাসেও টড্ প্রণীত 'রাজস্থান' গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য স্থান অনস্বীকার্য। তবে একথাও সত্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত বংলা সাহিত্যে ইতিহাস মুখ্যতঃ

সুলভ রোমান্স সৃষ্টির উপাদান হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই স্বাদেশিক চেতনার উদ্বোধন ব্যতীত সুলভ রোমান্স সৃষ্টির উপাদান হিসাবেও 'রাজস্থানে'র ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

টডের রচিত 'রাজস্থান' গ্রন্থখানি যে যথার্থ ইতিহাসের মর্যাদা লাভের অধিকারী নয়, তা বর্তমানে প্রমাণিত। কারণ, আজ আর অবিদিত নেই যে, টড্ তাঁর গ্রন্থে বহু অনৈতিহাসিক তথ্য এবং কিংবদন্তীকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে লেখকের নিজের গ্রন্থ সম্পর্কিত মন্তব্যটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

"I should observe, that it never was my intention to treat the subject in the severe style of History, which would have excluded many details useful to the politician as well as to the curious student. I offer this work as a copious collection of materials for the future historian; and am far less concerned at the idea of giving too much, than at the apprehension of suppressing what might possibly be useful."

সুতরাং 'রাজস্থান' গ্রন্থের ঐতিহাসিকত্ব নিরূপণ বিষয়ে অধিকতর প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। তবে যে সময়ে এই গ্রন্থকে উপন্যাস-কাব্য-নাটকাদি রচনার উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, সে সময়ে গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মর্যাদা ছিল অক্ষুণ্ণ। তথাপি 'রাজস্থানে' বর্ণিত বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটক-উপন্যাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে রচয়িতাগণ সর্বত্রই টডের গ্রন্থের যথাযথ অনুসরণ করেন নি। কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাস-নাটক প্রভৃতি সর্বোপরি সাহিত্য। আর ইতিহাস ও সাহিত্য যেহেতু এক বস্তু নয়, সেইহেতু সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতা স্বীকার না করে উপায় নেই। 'রাজস্থান' অবলম্বনে রচিত গ্রন্থগুলিতেও অনেক ঘটনা, চরিত্র প্রভৃতির ব্যাপারে লেখকেরা কম-বেশী নিজেদের স্বাধীন কল্পনার স্বাক্ষর রেখেছেন।

'রাজস্থান' গ্রন্থের বিষয়বস্তু অবলম্বনে বাংলায় রচিত প্রথম নাটক

মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। বেলগাছিয়া নাট্যশালার তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মধুসূদনকে পরামর্শ দেন রাজপুতদের ইতিহাস অবলম্বনে নাটক রচনা করতে :

"রাজপুত জাতির ইতিহাস এরূপ বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভাবান্ পুরুষ তাহা হইতে অনায়াসেই গ্রন্থ রচনার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।"
এই জন্যই মধুসূদন রাজপুতজাতির কাহিনী অবলম্বনে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন।

মধুসূদন তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিলেন টড্ প্রণীত 'রাজস্থান' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত সপ্তদশ অধ্যায় থেকে। স্বয়ং নাট্যকারের ভাষায় :

'The plot is taken from Tod, vol I p 461' ; তবে প্রয়োজনবোধে নাট্যকার অপরাপর অধ্যায় থেকেও কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করেছিলেন।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী রাজকুমারী কৃষ্ণার পাণিগ্রহণে জয়পুরের মহারাজা জগৎসিংহ এবং অম্বরাধিপতি মানসিংহ ছিলেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার উভয়ের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন একাধিক অধিপতি—মহারাষ্ট্রের অধিপতি, যবনপতি আমীর, ধনকুলসিংহ প্রভৃতি। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণা স্বয়ং মৃত্যুবরণ করে সকল-প্রকার বিরোধের অবসান ঘটিয়েছেন। টড্ তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

"Kishna Komari (the virgin Kishna) was name of the lovely object, the rivalry for whose hand assembled under the banners of her suitors, (Juggut Sing of Jeypur, and Raja Maun of Marwar ;) not only their native chivalry, but all the predatory

powers in India; and who like Helen of old, involved in destruction of her own and the rival houses."

কৃষ্ণকুমারীকে কেন্দ্র করে জগৎসিংহ এবং রাজা মানসিংহের মধ্যে যে বিরোধের সূত্রপাত হয়, তার মূলে ছিল কৃষ্ণার অপরূপ সৌন্দর্য। নাটকে কৃষ্ণার সৌন্দর্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। মদনিকা, জগৎসিংহের মন্ত্রী—প্রত্যেকেই একবাক্যে কৃষ্ণার অপরূপ রূপ-লাবণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। টডের গ্রন্থেও কৃষ্ণার অপরূপ সৌন্দর্য সম্বন্ধে বর্ণিত হতে দেখা গেছে ঃ

"Kishna Komary Bai, the 'Virgin Princess Kishna', was in her sixteenth year......sprung from the noblest blood of Hind, she added beauty of face and person to and engaging demeanour and was justly proclaimed the flower of Rajasthan."

নাটকে পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম জয়পুরের মহারাজা জগৎসিংহকে দুশ্চরিত্র, বিলাসী এবং দেহলোলুপ কামুক চরিত্ররূপে চিত্রিত করা হয়েছে। জগৎসিংহের সকলপ্রকার দুষ্কর্মের সঙ্গী ধনদাস, ভীমসিংহের মন্ত্রী সত্যদাস, রাজা মানসিংহের দূত এমন কি জগৎসিংহের অনুরাগিণী বিলাসবতীকেও জগৎসিংহের চরিত্র সম্বন্ধে তীব্র কটাক্ষ করতে দেখা গেছে। ফলে সহজেই এঁর রাজ্যের শোচনীয় অবস্থার কথা অনুমান করা যেতে পারে! যদিও এই শোচনীয় অবস্থা অপ্রাসঙ্গিক হেতু স্বাভাবিক কারণেই তা নাটকে বর্ণিত হয়নি। টডের গ্রন্থে সেই শোচনীয় অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে নাটকে জগৎসিংহের চরিত্রকে যেভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে, তার সঙ্গে টডের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বর্তমান। এমন কি টডের গ্রন্থে জগৎসিংহের রক্ষিতারূপে বর্ণিত 'Ras-Caphoor' বা 'Essence of Camphor'-কেই নাটকে 'বিলাসবতী' চরিত্রে পরিণত হতে দেখা গেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সমালোচকের মন্তব্য সম্বন্ধে উল্লেখ প্রয়োজন। সমালোচক বিলাসবতী এবং জগৎসিংহ-চরিত্র

সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে বিলাসবতী চরিত্রটি যেহেতু কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গ বহির্ভূত, সেইহেতু চরিত্রটি ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভের পক্ষে অনুপযুক্ত। কিন্তু, বিলাসবতী নামটি নাট্যকার প্রদত্ত হলেও চরিত্রটি যে টডের গ্রন্থ থেকেই গৃহীত তা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। আর কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গ বহির্ভূত বলে চরিত্রটির ঐতিহাসিক মর্যাদা অস্বীকার যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, কৃষ্ণকুমারীর অন্যতম পাণিপ্রার্থী জগৎসিংহেরই রক্ষিতা সে। সুতরাং চরিত্রটিকে নিতান্ত কাল্পনিক বলে অভিহিত করা চলে না। তবে নাট্যকার তাঁর কাহিনীটিকে জটিল করার অভিপ্রায়ে চরিত্রটিকে যে অধিকতর প্রাধান্য দান করেছেন তা অনস্বীকার্য। এইবার জগৎসিংহের প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। সমালোচকের বর্ণনানুযায়ী, "টডের রাজস্থানে জগৎসিংহ যোদ্ধা, রাজনৈতিক, কূটকৌশলে বিশেষ সিদ্ধ, প্রতিহিংসা-পরায়ণ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র। কিন্তু মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' তিনি প্রেমিক, পতিতার প্রতি আসক্ত, এমন কি, পতিতার পদধারণেও তাঁহার বিন্দুমাত্র লজ্জা নাই। এই জগৎসিংহ টডের জগৎসিংহ নহে, ইহা 'রত্নাবলী' কিংবা 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের বিদূষক সহচর রাজা চরিত্র। মধুসূদন রাজস্থান কাহিনীর বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র হইতে আনিয়া তাঁহাকে নারীর প্রেমচ্ছায়াতলে স্থাপন করিয়াছেন, ইহার ঐতিহাসিক মর্যাদা সেইজন্য রক্ষা পাইতে পারে নাই।"[২]

কিন্তু নাট্যকার জগৎসিংহ চরিত্রটিকে যে টডের বর্ণনানুসরণেই সৃষ্টি করেছেন তার নিদর্শনস্বরূপ টডের গ্রন্থ থেকে প্রামাণিক অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে:

Juggut Sing succeeded in A. D. 1803, and ruled for seventeen years, with the disgraceful distinction of being the most dissolute prince of his race or of his age. The events with which his

[২] নাট্যকার শ্রীমধুসূদন: ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য; পৃষ্ঠা ২৫৮।

reign is crowded, would fill volumes were they worthy of being recorded.

"......Sometimes the daily journals (akbars) disseminated the scandal of the rawula (female apartments), the follies of the libertine prince with his Concubine Ras-caphoor ('essence of camphor') or even less worthy objects, who excluded from the nuptial couch his lawful mates of the noble blood of Joda, or Jessa, the Rahtores and Bhattis of the desert.

The feudal chiefs held both his authority and his person in utter contempt, and the pranks he played with the 'Essence of Camphor' (ras-caphoor), at one time led to serious thoughts of deposing him ; which project, when near maturity, was defeatedby transferring "this Queen of half of Amber," to the prison of Nahrgurh. In the height of his passion for this Islamite Concubine, he formally installed her as Queen of half his dominions, and actually conveyed to her in gift a moiety of the personality of the crown, even to the invaluable literary of the illustrious Jey Sing, which was despoiled and its treasures distributed amongst her best relations. The Raja even struck coin in her name, and not only rode with her on the same elephant, but demanded from his chieftains those forms of reverence towards her, which were paid only to his legitimate Queens. This their pride could not brook, and though the Dewan, or Prime Minister, Misr Sheonarain, albeit a Brahmin, called her "daughter", the brave Chand Sing of Doonee indignantly refused to take part in any ceremony at which she was present.

নাটকে বর্ণিত হয়েছে অনন্যোপায় রাজা ভীমসিংহ শেষ পর্যন্ত রাজ্যের স্বার্থে কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আর এই হত্যার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ভীমসিংহের ভ্রাতা এবং উদয়পুরের সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের ওপর। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলেন্দ্র এই সুকঠিন দায়িত্ব পালনে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু টডের

বর্ণনায় দেখা যায় যে প্রথমে রাজা ভীমসিংহ তাঁর দুঃসম্পর্কীয় আত্মীয় দৌলৎ সিং-এর ওপর কৃষ্ণা-হত্যার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন :

Maharaja Dowlut Sing, descended from generations ago from one common ancestor with the Rana, was first sounded "to save the honour of Oodipur," but horror-struck, he exclaimed, accused the tongue that commands it।

কিন্তু দৌলৎসিং এ কার্যে অস্বীকৃত হলে তখন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল মহারাজা জোয়ানদাসের ওপর :

The Maharaja Jowandas, a natural brother was then called upon ; the dire necessity was explained, and it was urged that no common hand could be armed for the purpose.

—নাটকে এই জোয়ানদাসই রূপান্তরিত হয়েছেন বলেন্দ্র সিংহে। অবশ্য নামের ব্যাপারে বৈসাদৃশ্য থাকলেও, কৃষ্ণার হত্যার ব্যাপারে উভয়ের আচরণ ও মানসিকতায় যথেষ্ট সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে। দু'জনেই রাজকুমারীর প্রতি স্নেহাসক্ত। দু'জনেই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৃষ্ণার হত্যার দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন।

নাটকে জগৎসিংহের পক্ষ সমর্থনকারী ধনকুলসিংহের যে পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে, টডের গ্রন্থেও তার সমর্থন রয়েছে। নাটকে বর্ণিত হয়েছে, ধনকুলসিংহ মরুদেশের মৃত রাজা ভীমসিংহের পুত্র। কিন্তু পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায় কেউ কেউ তাঁকে ভীমসিংহের পুত্র বলে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। টডও তাঁর গ্রন্থে মরণোত্তর জাতক ধনকুলসিংহের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করে বলেছেন :

His (Raja Maun) predecessor, Raja Bheem, left a widow pregnant ; she concealed the circumstances, and when delivered, contrived to convey the child in a basket to Sowaie Sing of Pokurn. During two years he kept the secret ; he at length conveyed the Marwar chieftains, with whole concurrence he communicated it to Raja Maun, demanding the cession of

Nagore and its dependencies as a domain, for this, infant, named Dhonkul Sing, the heir apparent of Marwar.

আর ধনকুলসিংহকে পুত্র বলে স্বীকার করতে স্বয়ং ভীমসিংহের বিধবা পত্নীও অস্বীকার করেছিলেন :

She disclaimed the child.

তবে নাটকে যেখানে জগৎসিংহকেই মানসিংহের বিরুদ্ধে ধনকুলসিংহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে দেখা গেছে, টডের বর্ণনায় সেক্ষেত্রে ধনকুলসিংহের পক্ষকেই যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী দেখান হয়েছে। নাটকের ঘটনানুযায়ী যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে জগৎসিংহকেই প্রয়াসী করে নাট্যকার নাট্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকীয় বিচারে এই পরিবর্তন উপযুক্ত, যুক্তিসঙ্গত ও শিল্পগুণমণ্ডিত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

কৃষ্ণার চরিত্রাঙ্কনেও নাট্যকার টডেরই অনুসরণ করেছেন। এমন কি হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বিচলিত ভীমসিংহের উন্মত্তবৎ আচরণে খুল্লতাত বলেন্দ্রসিংহের নিকটে জীবন সম্বন্ধে কৃষ্ণার দার্শনিক সুলভ উক্তি এবং মহত্তর কারণে আত্মবিসর্জনের পারিবারিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে তার সচেতনতার সমর্থনও টডের গ্রন্থে বর্তমান। অবশ্য টডের বর্ণনায় এ সকল প্রসঙ্গ কৃষ্ণা তার মাতার কাছে প্রকাশ করেছে :

"Why afflict yourself, my mother, at this shortening of the sorrows of life ? I fear not to die ! Am I not your daughter ? Why should I fear death ? We are marked out for sacrifice from our birth ; we scarcely enter the world but to be sent out again."

অপরপক্ষে নাটকে কৃষ্ণাকে তার খুল্লতাতের কাছে এই ধরণের বক্তব্য প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

নাটকে মধুসূদন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছেন রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যুর ঘটনাটিতে। নাটকে কৃষ্ণকুমারীকে স্বহস্তে

খড়্গাঘাতে মৃত্যুবরণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু টডের গ্রন্থে কৃষ্ণার বিষপানে (ঘুমের ওষুধ) মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাও একাধিকবার সেবনের ফলে। কৃষ্ণার মৃত্যু দৃশ্যটিকে অধিকতর নাটকীয় করার উদ্দেশ্যেই নাট্যকার এরূপ পরিবর্তন সাধন করেছিলেন বোঝা যায়। কারণ বিষপানে মৃত্যু অপেক্ষা খড়্গাঘাতে মৃত্যুর দৃশ্য 'Stage effect' সৃষ্টিতে অধিকতর ফলপ্রসূ। নাটকের এই দৃশ্য তথা সমগ্র পঞ্চমাঙ্ক সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের নিকট প্রকাশিত মধুসূদনের অভিমতটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ

"I flatter myself you will like the Fifth Act. I shed tears when poor Kissen Kumari stabbed herself and fell on her bed!"

মধুসূদনের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, নাটকের দর্শকেরাও খড়্গাঘাতে মৃত্যুবরণের জন্যই হতভাগ্য কৃষ্ণার প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল হয়ে তাঁর মতই অশ্রু বিসর্জন করবে।

নাটকে বর্ণিত রাজমহিষী অহল্যা চরিত্রটিকে কোন সমালোচক অনৈতিহাসিক চরিত্ররূপে অভিহিত করেছেন। কিন্তু 'অহল্যা' নামটি মধুসূদনের আরোপিত হলেও চরিত্রটি টডের গ্রন্থ থেকেই গৃহীত। নাটকে বর্ণিত অহল্যার আচরণের সঙ্গে টডের গ্রন্থে বর্ণিত কৃষ্ণার জননীর গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণার মৃত্যুর পর হতভাগ্য জননী অহল্যা কন্যার জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন, টডের গ্রন্থেও তার সমর্থন মেলেঃ

The shrieks of frantic mother reverberated through the palace as she implored mercy, or execrated the murderers of her child, who alone was resigned to her fate.

নাটকে কৃষ্ণার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজমহিষী অহল্যার মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়েছে। টডের গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছেঃ

The wretched mother did not long survive her child;

nature was exhausted in the ravings of despair ; she refused food ; and her remaining in a few days followed those of her daughter to the funeral pyre.

তবে টডের বর্ণনার তুলনায় নাটকে অহল্যা চরিত্রটিকে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে নিঃসন্দেহে।

পরিশেষে বলতে হয় যে, রাণা ভীমসিংহ কিংবা রাজভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহের দু'একটি বিক্ষিপ্ত উক্তিতে দেশপ্রেমের অস্পষ্ট ইঙ্গিত অভিব্যক্ত হলেও, রঙ্গলাল কিংবা পরবর্তীকালের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের মত স্বদেশপ্রেম প্রচারের মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মধুসূদন তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করেন নি। মধুসূদনের স্বল্প পরিসর সাহিত্যিক জীবন সাহিত্য সৃষ্টির নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অতিবাহিত। 'রাজস্থান' গ্রন্থের অন্তর্গত বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটিও তারই একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন-রূপে গৃহীত হবার যোগ্য।

২

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'আনন্দরহো' (১২৮৮)। বলাবাহুল্য টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে তাঁর রচিত এটি প্রথম এবং বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিতীয় নাটক। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট। এটি প্রথম অভিনীত হয় ন্যাশানাল থিয়েটারে ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বঙ্গাব্দে। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা ছিল মূলতঃ পৌরা-ণিক নাটক রচনার উপযোগী। অবশ্য ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তিনি পরবর্তীকালে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর নাটকে তাঁর তথ্যানুগত্যের উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু 'আনন্দরহো' নাটকটি গিরিশ প্রতিভার কোন স্বাক্ষরই বহন করেনা। নাটকটি গিরিশচন্দ্রের নিতান্ত অক্ষম রচনা। নাট্য-

কারের বক্তব্য নাটকটিতে তেমন পরিস্ফুট হয়নি। নাটকের পাত্র-পাত্রীরাও তেমন জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেনি। 'ভারতী' পত্রিকায় এই নাটক সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য : 'গিরিশবাবুর লেখায় আমরা এরূপ কল্পনার অরাজকতা আশা করি নাই'—বাস্তবিক অস্বীকার করা যায় না।

গিরিশচন্দ্র তাঁর এই নাটকটিতে টডের 'রাজস্থানে'র বিষয়বস্তু গ্রহণ করলেও পরিমাণে তা নিতান্তই অল্প। 'আনন্দরহো' নাটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—ক্রমবর্ধমান শক্তির অধিকারী আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহের আচরণে সম্রাট শঙ্কিত এবং ক্ষুব্ধ। বিশেষতঃ সম্রাটের উত্তরাধিকারী সেলিমের পরিবর্তে সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র খসরুকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে রাজা মানসিংহের ষড়যন্ত্র আকবর ছলে, বলে, কৌশলে ব্যর্থ করতে মনস্থ করেছেন। শেষ পর্যন্ত বিষপ্রয়োগে মানসিংহের প্রাণহরণে প্রয়াসী হয়েছেন তিনি। কিন্তু সম্রাটের চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং নিজেই নিজের চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়েছেন। এ ছাড়াও নাটকটিতে মানসিংহের কন্যা লহনার প্রেম, রাণা প্রতাপের কাছে আকবরের সন্ধির প্রস্তাব, রাণা প্রতাপের মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ও স্থান পেয়েছে।

সম্রাট আকবর কর্তৃক বিষপ্রয়োগে মানসিংহকে হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যাপারটি অত্যন্ত বিতর্কমূলক[৩] হলেও নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত নয়। 'রাজস্থান' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে :

---

৩ I do not believe a word of the story about the alleged accidental self-poisoning in any of its forms, although it is true that Akbar, like many European princes of his time, did remove several of his enemies by secret assassination, probably using poison in certain cases. On the whole, while it is perhaps most probable that Akbar died a natural death, the general belief that

A desire to be rid of the great Raja Maun of Amber, to whom he was so much indebted, made the emperor descend to act the part of the assassin. He prepared a majoom, or confection, a part of which contained poison ; but caught in his own snare, he presented the innoxious portion to the Rajpoot and ate that drugged with death himself.

টড্ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ করে আরও বলেছেন,

We have a sufficient clue to the motives which influenced Akbar to a deed so unworthy of him, and which were more fully developed in the reign of his successor ; namely, a design on the part of Raja Maun to alter the succession, and that Khoosru, his nephew, should succeed instead of Selim.

সম্রাট আকবর মহারাণা প্রতাপের কাছে সৌহার্দ যাচ্ঞা করে পত্র প্রেরণ করলে প্রখর আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন প্রতাপের কাছে তা অক্ষমের নিকট বলবানের কৃপা প্রদর্শন তথা অপমান বলে অনুভূত হয়েছে। বিশেষতঃ, তাঁর সভাসদ্‌গণ এ ব্যাপারে প্রতাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আকবরের আবেদনে সাড়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় প্রতাপ ক্ষোভে-দুঃখে শয্যাশায়ী হয়েছেন। 'রাজস্থান' গ্রন্থে প্রতাপের আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে :

but for the high-minded, the generous Rajpoot, to be the object of that sickly sentiment, pity, was more oppresive than the arms of his foe.

ব্যথিত প্রতাপকে নাটকে তাঁর মন্ত্রী ভামসার উদ্দেশে অনুযোগ করতে দেখা গেছে :

মন্ত্রি ! তোমার মনে এই ছিল ! আমি তো হল্‌দিঘাটের পর

he was poisoned in some fashion by somebody may have been well-founded. The materials do not warrant a definitive judgement. (Akbar the Great Mogul by vincent A smith ; chap XI ; Page 326)

অর্থহীন দীন হয়েছিলেম, কেন তুমি তোমার সমুদয় অর্থ দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে, কেন তুমি আমায় আবার রণ-রঙ্গে মাতালে ?

(দ্বিতীয় অঙ্ক ; চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ;)

মন্ত্রী-ভামসা কর্তৃক প্রতাপকে অর্থ সাহায্যদানের বিষয়টি 'রাজস্থান' গ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে :

The minister of Pertap, whose ancestors had for ages held the office, placed at his prince's disposal their accumulated wealth, which, with other resources, is stated to have been equivalent to the maintenance of twenty-five thousand men for twelve years. The name of Bhama Sah is preserved as the saviour of Mewar.

টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে গিরিশচন্দ্রের সার্থক ঐতিহাসিক নাটক 'চণ্ড', ১২৯৭ সালের ১১ই শ্রাবণ সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। নাটকটি চতুর্থাঙ্ক বিশিষ্ট এবং 'রাজস্থানে'র সপ্তম পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত। টড্ অভিমত প্রকাশ করেছেন :

"If devotion to the fair sex be admitted as a criterion of civilization, the Rajpoot must rank high. His susceptibility is extreme, and fires at the slightest offence to female delicacy, which he never forgives."

—উপরোক্ত মন্তব্যের সমর্থনেই টড্ চিতোরের রাজকুমার চণ্ডের কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। রাঠোরের রাজকুমারীর বিবাহের প্রস্তাবসহ ভাট নারকেল নিয়ে উপস্থিত হলে চিতোরের বৃদ্ধ রাণা লাক্ষ, রাজকুমারীকে নিয়ে পরিহাস করেন :

The messenger of Hymen was courteously received by Lakha, who observed that Chonda would soon return and take the gage ; "for", added he, drawing his fingers over his mustachio, "I don't suppose you send such play things to an old greybeard like me.

—এই পরিহাসের জন্য রাজকুমার চণ্ড রাঠোর রাজকুমারীকে বিবাহ করতে অস্বীকৃত হন। পিতা যে কন্যাকে নিয়ে পরিহাস করেন,

কোনমতেই তিনি তাঁর বিবাহ যোগ্যা হ'তে পারেন না, তিনি তাঁর মাতৃস্থানীয়া। অতঃপর বৃদ্ধ রাণা স্বয়ং রাঠোর রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে বঞ্চিত করে নব পরিণীতা স্ত্রীর পুত্রকে সিংহাসন দানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তদনুযায়ী বৃদ্ধরাণা লাক্ষ গয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলে পঞ্চম বর্ষীয় মুকুলকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে চণ্ড রাজ্য শাসন করতে থাকেন। কিন্তু তারপর মুকুলের মাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী চণ্ড নির্বাসিত হন এবং সেই সুযোগে রাঠোরাধিপতি সদলবলে চিতোরে উপস্থিত হয়ে ক্রমে চিতোরে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। অসহায় রানী শেষ পর্যন্ত চণ্ডেরই সহায়তায় রাঠোরদের কবল থেকে রক্ষা লাভ করেন। পুনরায় মুকুল চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়।

বলাবাহুল্য, এ হেন কাহিনী নাটক রচনার উপাদান হিসাবে অতীব উপযুক্ত। গিরিশচন্দ্রও তাঁর নাটকে কাহিনীটিকে উপযুক্ত ভাবেই ব্যবহার করেছেন। এবং প্রয়োজন মত স্বাধীন কল্পনার দ্বারা নাট্য কাহিনীকে অধিকতর আকর্ষণীয় এবং মনোজ্ঞ করে তুলেছেন। প্রসঙ্গতঃ, লাক্ষরাণার মহিষীর সখী বিজরীকে লাক্ষ রাণার মধ্যম রাজকুমার রঘুদেবজীর প্রতি আকৃষ্ট করে প্রতিহিংসাপরায়ণ রণমল্ল কর্তৃক রঘুদেবের হত্যা এবং সেই সঙ্গে রণমল্লের পতনকে সংযুক্ত করে নাটকীয়তা সৃষ্টির বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন গিরিশচন্দ্র। অবশ্য নাটকে এতাদৃশ স্বাধীন চিন্তার পরিচয় নিতান্তই সীমিত ক্ষেত্রে বর্তমান। নাটকটির আদ্যন্ত টডের কাহিনী অনুসরণেই রচিত। নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির প্রায় সব কয়টিই ঐতিহাসিক; কয়েকটি ক্ষেত্রে নাট্যকার স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী নামকরণ করলেও, চরিত্রগুলির উল্লেখ টডের গ্রন্থে বর্তমান। প্রসঙ্গতঃ পূর্ণরাম ভাট, বিজরী, গুঞ্জমালা, কুশলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত রাঠোর রাজকুমার 'যোদা'

নাটকে 'যোধরাও' এবং রাঠোরাধিপতি 'রাওরিণমুল' 'রণমল্লে' রূপান্তরিত হয়েছেন।

নাটকের মুখ্য চরিত্র চণ্ডের মহান ত্যাগ, বীরত্ব এবং উদারতা টডের কাহিনী অনুসরণেই চিত্রিত। চণ্ডের মহান আত্মত্যাগ একমাত্র 'মহাভারতে'র ভীষ্ম চরিত্রের সঙ্গেই উপমিত হবার যোগ্য। নাটকে বর্ণিত হয়েছে :

গয়াধামে ধর্ম্মরণে লাক্ষরাণা যবে
করিল গমন, চণ্ডে দিতে সিংহাসন
বাঞ্ছা ছিল তাঁর, কেবা হতো প্রতিবাদী,
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য-অধিকারী চিরদিন ;
কে করিত নিবারণ মুকুট গ্রহণ
চণ্ডের, কেমনে বা মুকুল পাইত
রাজ্যভার ? উদার—স্বভাব মতিমান,
পিতারে প্রতিজ্ঞা হতে করিল উদ্ধার,

টডও উপরোক্ত ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

the Rana of cheetore journeyed to this bourne, he was desirous to leave his throne unexposed to civil strife. The subject of succession had never been renewed ; but discussing with chonda his warlike pilgrimage to Gya, from which he might not return, he sounded him by asking what estates should be settled on Mukul. "The throne of cheetore", was the honest reply ; and to set suspicion at rest, he desired that the ceremony of installation should be performed previous to Lakh's departure. Chonda was the first to pay homage and swear obedience and fidelity to his future sovereign.

চণ্ডের বিরল কর্তব্য পরায়ণতা এবং নির্লোভ আচরণ 'রামায়ণে'র ভরত চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে বালক রাণা মুকুলের পক্ষে নিঃস্বার্থভাবে বিষয়-বিরাগী সন্ন্যাসীর ন্যায়

রাজ্যশাসন এবং অনুজ রঘুদেবের প্রতি তার সুগভীর স্নেহ-প্রীতি বাস্তবিকই অতুলনীয়। চণ্ডের মাতৃভক্তির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাণী গুঞ্জমালা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বশতঃ চণ্ডের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছেন, নানাভাবে তার ওপর নির্যাতন করে শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগী হতে বাধ্য করেছেন। তথাপি এ হেন বিমাতা, রাণী গুঞ্জমালার প্রতি চণ্ডের কখনও বিরূপতা লক্ষ্য করা যায় নি। অভিমান-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে বিমাতার আদেশই শুধু তিনি শিরোধার্য করেন নি, সেইসঙ্গে রাণীর আহ্বান মাত্র অসহায় বিমাতা এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতার রক্ষাকল্পে সাড়া দিয়ে রাঠোরদের কবল থেকে চিতোর উদ্ধার করেছেন।

চণ্ডের বীরত্ব, দূরদৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তাও প্রশংসনীয়। রাণী গুঞ্জ-মালার নির্দেশে নির্বাসনকে শিরোধার্য করলেও অসহায় রাণার ভাবী বিপদ সম্বন্ধে চণ্ড ছিলেন অবহিত। তাই পূর্ব থেকেই তিনি চিতোর তথা বালক রাণার রক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং উপযুক্ত প্রয়োজনের সময় তা সার্থকভাবে কার্যকরীও হয়েছে। মিষ্টান্ন বিতরণ উৎসব চণ্ডের পরামর্শেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং দেওয়ালী উৎসবে যখন সমগ্র চিতোর রাজ্য আনন্দে মত্ত, সেই সুযোগে চিতোরে উপস্থিত হয়ে রাঠোরদের আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করার পরিকল্পনা রচনার কৃতিত্বও তাঁরই। টডের গ্রন্থেও এই বিষয়টি বর্ণিত হতে দেখা গেছে—

Chonda, though at a distance, was not inattentive amongst the Rojpoots. At his departure he was accompanied by two hundred Ahaireas or huntsmen, whose ancestors had served the princes of cheetore from ancient times. These had left their families behind, a visit to whom was the pretext for their introduction to the fort. They were instructed to get into the service of the keepers of the gates, and being considered more attached to the place than to the family, their object was

effected. The Queen-mother was counselled to cause the young prince to descend daily with a numerous retinue to give feasts to the surrounding villages, and gradually to increase the distance, but not to fail on the "festival of lamps" to hold the feast of Gosoonda.

রাঠোরাধিপতি রণমল্লের রাজ্যতৃষ্ণা এবং কামুক চরিত্রের পরিচয়ও 'রাজস্থানে' বিদ্যমান। এমন কি রণমল্লের পতনের ক্ষেত্রেও নাট্যকার 'রাজস্থানে'র ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন।

রাণী গুঞ্জমালার ক্ষমতালিপ্সা এবং চণ্ডের উপর অন্যায় আক্রোশবশতঃ তার বিরুদ্ধে রাণীর প্রতিশোধমূলক আচরণের সমর্থনও 'রাজস্থানে' মেলে।

লাক্ষরাণার মধ্যম রাজকুমার রঘুদেবজীকে নাট্যকার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরূপে চিত্রিত করেছেন। 'রাজস্থানে' অবশ্য রঘুদেবের নানা মহৎ গুণাবলীর কথা বর্ণিত হলেও তার সন্ন্যাস গ্রহণের বিষয় উল্লিখিত হয়নি ; উল্লিখিত হয়নি তার একান্তে ঈশ্বর আরাধনার কথা। কেবলমাত্র বর্ণিত হয়েছে, রঘুদেব রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে বসবাস করতেন। তবে রণমল্ল কর্তৃক রঘুদেবের উদ্দেশে বস্ত্রপ্রেরণ এবং সেই বস্ত্র পরিধানের অবকাশে রঘুদেবকে হত্যা করার বিষয়টি 'রাজস্থানে' বর্তমান।

—Rao Rinmul sent a dress of honour, which etiquette requiring him to put on when presented, the prince (Raghudeva) was assassinated in the act.

চিতোর বাসীর নিকট রঘুদেবের অসীম জনপ্রিয়তা, বিশেষত, তার হত্যার পর চিতোরবাসীর মনে রঘুদেবের অমোঘ প্রভাবের বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে 'রাজস্থানে' বলা হয়েছে :

Raghudeva was so much beloved for his virtues, courage, and manly beauty, that his murder became martyrdom, and obtained for him divine honours, and a place amongst the Diipatree (Pitri—deva) of Mewar. His image is on every hearth, and is daily worshipped with the Penates.

—নাটকেও এই ঘটনার ঘনিষ্ঠ অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

পরিশেষে, গিরিশচন্দ্র তাঁর সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'আনন্দ রহো' গদ্যে রচনা করলেও 'চণ্ড' নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন। অবশ্য তাই বলে নাটকটি আদ্যন্ত অমিত্র ছন্দে রচিত নয়। পূর্ণরাম ভাট, মুকুল, সভাসদ্‌গণ, প্রজা প্রভৃতিদের সংলাপ গদ্যে রচিত। আবার রণমল্ল, বিজরী, চণ্ড, গুঞ্জমালা প্রমুখাদির ক্ষেত্রেও অমিত্র ছন্দ ব্যতীত মাঝে মাঝে গদ্য সংলাপ ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।

টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যে যতগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে আবার 'রাজস্থানে'র অন্যতম আকর্ষণ-রাণা প্রতাপ সিংহের কাহিনী অবলম্বনে রচিত গ্রন্থাদির সংখ্যা সর্বাধিক। রাজপুত ইতিহাসে প্রতাপের ন্যায় বীর, স্বদেশ প্রেমিক, অসীম কষ্ট সহিষ্ণু ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাণার চরিত্র তথা কাহিনী সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে থাকে। মহাকবি গিরিশচন্দ্রও আকৃষ্ট হয়েছিলেন রাজপুত জাতির গৌরব, মহান রাণা প্রতাপের চরিত্র এবং জীবনী অবলম্বনে নাটক রচনায়। ১৩১০ বঙ্গাব্দের শেষভাগে গিরিশচন্দ্র 'রাণা প্রতাপ' নাটক রচনায় ব্রতী হন। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের কিয়দংশ (২য় অঙ্ক) রচনার পর নাটকটির রচনা বন্ধ রাখেন। এই অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত নাটকটি ১৩১৪ সালে 'অর্চ্চনা' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'আনন্দ রহো' নাটক রচনার সময়েই গিরিশচন্দ্র সম্ভবতঃ রাণা প্রতাপের চরিত্র ও কার্যাবলীর প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এবং পরবর্তী কালে রাণা প্রতাপ অবলম্বনে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। নাটকের কিয়দংশ রচনার পর নাটকটিকে অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। অতঃপর নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপ সিংহ' (১৯০৫) প্রকাশিত হওয়ায় গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা আর

বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি। তবে গিরিশচন্দ্র 'রাণা প্রতাপ' নাটকটির আদ্যন্ত যে টডের অনুসরণেই রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তা অসমাপ্ত নাটকের তথ্যাবলীর সঙ্গে 'রাজস্থান' গ্রন্থের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থেকেই সহজে অনুমিত হয়।

৩

নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা এবং ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তনের মাধ্যমে দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিশেষভাবে নাট্যকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বাস্তবিক, মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'কে অবলম্বন করে বাংলায় ঐতিহাসিক নাটকের যে শুভ সূচনা ঘটে এবং যে ধারা শেষ পর্যন্ত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভায় চরমোৎকর্ষ লাভে সমর্থ হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সেই ধারাটিকেই বিশেষভাবে পুষ্ট করেছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। মধুসূদনের নাটকে দেশপ্রেমের যে অস্পষ্ট এবং অস্বচ্ছ ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে তা সুস্পষ্ট এবং স্বচ্ছরূপ পরিগ্রহ করে। অবশ্য মৌলিক নাটক রচনা অপেক্ষা প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী বা চিতোর-আক্রমণ নাটক'টি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর। নাটকটি 'উদাসিনী' প্রণেতা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে উৎসর্গ করা হয়। নাটকটি আলাউদ্দিনের দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত।

ভৈরবাচার্য নামধারী ছদ্মবেশী এক মুসলমান উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে মেওয়ারের রাণা লক্ষ্মণসিংহকে আলাউদ্দিনের হাত থেকে চিতোর রক্ষার শর্ত স্বরূপ চতুর্ভুজা দেবীর নিকট তাঁর একমাত্র কন্যা

সরোজিনীকে বলিদানের জন্য বলেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ভৈরবাচার্য রাণার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য দৈববাণীর ছলনা গ্রহণ করেছিলেন। চিতোর রক্ষার প্রয়োজনে প্রাণাধিক কন্যার জীবন বলিদানের ব্যাপারে লক্ষ্মণসিংহ মহা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হন। শেষে রাজপুত সৈন্যদের প্রবল চাপে সর্বোপরি ভৈরবাচার্য ও সেনাপতি গারাধিপতি রণধীরসিংহের প্রবল তাড়নায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাণা তাঁর একমাত্র কন্যা সরোজিনীকে চতুর্ভুজার কাছে বলিদানে সম্মত হন। কিন্তু এ ব্যাপারে বাধ সাধলেন লক্ষ্মণসিংহের ভাবী জামাতা বাদলাধিপতি বিজয়সিংহ। সরোজিনীকে বলিদানের অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে বিজয়সিংহের হস্তক্ষেপে সরোজিনীর জীবন রক্ষা পায় এবং ঘটনাচক্রে ভৈরবাচার্য কর্তৃক তাঁর কন্যা রোশেনারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পূর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থানুযায়ী ইতিমধ্যে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন। চিতোর রক্ষার্থে রাজপুত বীরগণ আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু সকল প্রয়াসই হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। শেষে সরোজিনীসহ সকল রাজপুত রমণী কঠিন জহরব্রতের অনুষ্ঠানে জীবন বিসর্জন করেন। আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ ব্যর্থ হয়।

আলোচ্য নাটকটির পটভূমি ঐতিহাসিক হলেও নাটকে বর্ণিত মুল ঘটনা অনৈতিহাসিক এবং নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত। ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর অপরূপ রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ, চিতোর দুর্গের পতনে রাজপুত রমণীদের কঠিন জহরব্রতের অনুষ্ঠানে আত্মবিসর্জন—প্রভৃতি বিষয়গুলি 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে সত্য। এমন কি রাণা লক্ষ্মণসিংহের দৈববাণী শ্রবণের বিষয়টিও 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে। তবে 'রাজস্থানে' চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর তৃপ্তিবিধানে রাণার দ্বাদশটি পুত্রের আত্মবলিদানের নির্দেশই কেবলমাত্র উল্লিখিত হয়েছে।—

the Rana, after an arduous day, stretched on his pallet,

and during a night of watchful anxiety, pondering on the means by which he might preserve from the general destruction one at least of his twelve sons ; when a voice broke on his solitude, exclaiming "Myn bhooka ho ;" and raising his eyes, he saw, by the dim glare of the cheragh (lamp), advancing between the granite columns, the majestic form of the guardian goddess of Cheetore. "Not satisfied," exclaimed the Rana, "though eight thousand of my Kin were late an offering to "thee" ?—"I must have regal victims ; and if twelve who "wear the diadem bleed not for Cheetore, the land will pass from the line." This said, she vanished.[8]

নাট্যকার নাটকে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে চতুর্ভুজাকে অভিহিত করেছেন। এবং 'রাজস্থানে' বর্ণিত দেবীর নির্দেশদানকে নাটকে ভৈরবাচার্যরূপী মহম্মদ আলির ষড়যন্ত্র বলে নাট্যকার বর্ণনা করেছেন। সর্বোপরি নাটকের মুখ্য বিষয়—সরোজিনীর বলিদান প্রসঙ্গটিও নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত। সরোজিনীর বলিদানকে কেন্দ্র করে রাণা লক্ষ্মণসিংহের যে মানসিক দ্বন্দ্ব, তা সঙ্গতকারণেই 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কৃষ্ণকুমারীর হত্যার ব্যাপারে রাণা ভীমসিংহের দ্বন্দ্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' খ্যাত রঘুপতির চরিত্রের সঙ্গে ভৈরবাচার্যের চরিত্রের গভীরতর সাদৃশ্যেরও উল্লেখ

[8] চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আবির্ভাব এবং চিতোর রক্ষার্থে তাঁর নির্দেশদানের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে টড্ মন্তব্য করেছেন—'whether we have merely the fiction of the poet, or whether the scene was got up to animate the spirit of resistance, matters but little, it is consistent with the belief of the tribe ; and that the goddess should openly manifest her wish to retain as her tiara the battlements of Cheetore on conditions so Congenial to the warlike and superstitious Rajpoot, was a gage readily taken up and fully answering the end.'

করতে হয়। সর্বোপরি অনেকের মতেই 'সরোজিনী' নাটকটিতে ইউরিপিডিসের 'Iphigenia at Aulis' নাটকটির প্রভাব বিদ্যমান।[৫]

গতি, দ্বন্দ্ব প্রভৃতির বিচারে 'সরোজিনী' নাটকটির অসাধারণ নাটকীয়তা অনস্বীকার্য হলেও, ঐতিহাসিকত্বের বিচারে নাটকটির দাবী তেমন যুক্তিগ্রাহ্য নয় বলা চলে।

'অশ্রুমতী' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৃতীয় মৌলিক নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং উল্লেখযোগ্য নাটকটি বিলাত প্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত।

'অশ্রুমতী' নাটকটি আপাতদৃষ্টিতে রাজপুতগৌরব মহারাণা প্রতাপসিংহের কাহিনীকেন্দ্রিক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি প্রতাপ-কন্যা অশ্রুমতী এবং আকবর-তনয় যুবরাজ সেলিমের অনৈতিহাসিক প্রণয় কাহিনীর নাট্যরূপ। তবে মহারাণা প্রতাপসিংহ বিষয়ে নাটকে যা বর্ণিত হয়েছে, সে বিষয়ে নাট্যকার টডের 'রাজস্থানে' বর্ণিত তথ্যাদির প্রতি ঘনিষ্ঠ আনুগত্য দেখিয়েছেন লক্ষ্য করা যায়।[৬] নাটকের সূচনাপত্রে নাট্যকার 'রাজস্থান' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন : 'There is not a pass in the alpine Aravalli that is not sanctified by some deed of Pertap—some brilliant victory, or oftener, more glorious defeat. Haldighat is the Thermopylae of Mewar ; the field of Deweir her Marathon.'—এই থেকেই নাট্যকারের প্রতাপ-অনুরক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যকারও স্বয়ং 'অশ্রুমতী' নাটক

৫ আর্য্যদর্শন ১২৮২ ; যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত।

৬ 'প্রতাপসিংহের ভূমিকা যথাসম্ভব ইতিহাসানুগত'—ডঃ সুকুমার সেন ; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; পৃ ২৯৮।

রচনার অভিপ্রায় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন : 'মহারাণা প্রতাপসিংহকে আমি আরাধ্য দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার কুলনিষ্ঠা, তাঁহার দেশভক্তি আমাদের আদর্শস্থল। চরিত্রের এই উচ্চ আদর্শ বঙ্গবাসীর সম্মুখে অর্পণ করাই এই নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি স্বীকার করি, 'অশ্রুমতী' বলিয়া প্রতাপসিংহের কোনো কন্যা ছিল না। ইহা আমার কল্পনামাত্র। আমার এইমাত্র বক্তব্য, এই নাটকে যে কল্পিত ঘটনাবলী যোজিত হইয়াছে তাহাতে প্রতাপসিংহের চরিত্র গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং আরও বৃদ্ধি হইয়াছে।'[৭] প্রথমে নাট্যবিষয়ের সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

রাণা প্রতাপসিংহ কর্তৃক অপমানিত মানসিংহ প্রতাপের কন্যা অশ্রুমতীকে অপহরণ করান। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সেনাপতি ফরিদ খাঁর সঙ্গে অশ্রুমতীর বিবাহ দিয়ে প্রতাপের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেলিম অশ্রুমতীকে উদ্ধার করেন এবং অশ্রুমতী ও সেলিম পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে বিকানীরের রাজকুমার পৃথ্বীরাজের বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু ফরিদখাঁর হাতে পৃথ্বীরাজ শোচনীয়-ভাবে নিহত হওয়ায় শক্তসিংহের মনোবাঞ্ছা বাস্তবে পরিণত হতে পারেনা। শক্তসিংহ অতঃপর সেলিমের ছুরিকাঘাতে আহত অশ্রুমতীকে মোঘলদের কবল থেকে মুক্ত করে মৃত্যুশয্যায় শায়িত প্রতাপের নিকট উপস্থিত করেন। প্রতাপ প্রথমে অশ্রুমতীকে কুলকলঙ্কিণীজ্ঞানে বিষপানে দেহত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু পরিশেষে শক্তসিংহের নিকট থেকে সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে তিনি অশ্রুমতীকে

---

[৭] ১লা অক্টোবর, ১৯০১ তারিখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক 'ভারতমিত্র' পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত।

চিরকুমারী যোগিনীর ব্রত অবলম্বনের নির্দেশ দান করে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

'অশ্রুমতী' নাটকে প্রতাপ বিষয়ক বর্ণনাদির ব্যাপারে এবং অপরাপর নানাবিধ ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনায় নাট্যকার টডের প্রতি আনুগত্য দেখালেও, এমনকি নাটকের অনেকস্থলে টডের বর্ণনার হুবহু অনুবাদ লক্ষ্য করা গেলেও, বিশেষ করে প্রতাপসিংহের কন্যা বলে বর্ণিত অশ্রুমতী ও তার সখী মলিনা—উভয় চরিত্রই যে নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত তা উল্লেখ করতে হয়। শুধুমাত্র তাই নয়, উভয়ের প্রেম কাহিনীও নাট্যকারের স্বাধীন সংযোজন। উল্লেখযোগ্য আলোচ্য নাটকটির অধিকাংশ স্থান এই কল্পিত প্রেমকাহিনীই অধিকার করে আছে।

সোলাপুর যুদ্ধ জয়ের পর প্রত্যাবর্তনের পথে মহারাজ মানসিংহ স্বয়ং মহারাণা প্রতাপের আতিথ্য গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মানসিংহের ভোজনের সময় প্রতাপের স্বেচ্ছাকৃত অনুপস্থিতিই শেষ-পর্যন্ত প্রতাপের সঙ্গে মানসিংহের বিরোধের কারণ রূপে দেখা দেয়। নাটকে বর্ণিত এই ঘটনা টডের গ্রন্থ থেকেই গৃহীত। এমন কি নাটকের পঞ্চমাঙ্কে মৃত্যুপথযাত্রী প্রতাপের যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে তাও 'রাজস্থান' গ্রন্থাবলম্বনেই। মৃত্যুকালে প্রতাপ তাঁর মানসিক উদ্বেগের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর পুত্র অমরসিংহের একদিনের আচরণের উল্লেখ করেন।—প্রতাপ যখন মোঘলের বিরুদ্ধে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন, শুধুমাত্র ঝড়-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার্থে পেশলা নদী তীরে কয়েকটি কুটীর নির্মাণ করে সেখানে অবস্থান করছিলেন, সেই সময়ে একদিন তাঁর পুত্র অমরসিংহ কুটীরের নিম্নতা বিস্মৃত হয়ে মাথা অবনত না করে প্রবেশ করতে গেলে কুটীরের ছাদের বাঁশে বেঁধে তার পাগড়ীটা যায় খুলে। এতে অমরসিংহের মুখমণ্ডলে যে বিরক্তির ভাব সূচিত হয়,

তা থেকেই প্রতাপের ধারণা হয় যে অমরসিংহের বিলাসিতা এবং আড়ম্বরপ্রিয়তাই শেষপর্যন্ত মেবারের স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর বিসর্জনের পথকে করবে প্রশস্ত।—এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে টড্ বলেছেন :

On the banks of Peshola, Pertap and his chiefs had constructed a few huts, to protect them during the inclemency of the rains in the day of their distress. prince Umra, forgetting the lowliness of the dwelling, a projecting bamboo of the roof Caught the folds of his turban and dragged it off as he retired. A hasty emotion, which disclosed a varied feeling was observed with pain by Pertap, who thence adopted the opinion that his son would never withstand the hardships necessary to be endured in such a cause.

পরাজিত প্রতাপের অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশার যে হৃদয়বিদারক চিত্র নাটকে বর্ণিত হয়েছে, তা পাঠকের মনকে সহজেই আদ্র´করে তোলে। এমনদিনও তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়েছে, যেদিন তাঁর সন্তানের মুখের গ্রাস ঘাসের দানার তৈরী সামান্য রুটি বনবিড়ালে নিয়ে যাওয়ায় কঠিন হৃদয়ের অধিকারী অসহায় প্রতাপও চোখের জল না ফেলে পারেন নি। টডের গ্রন্থেও অনুরূপ হৃদয়বিদারক ঘটনার সমর্থন মেলে—

On one occasion his Queen and his son's wife were preparing a few cakes from the flour of the meadow grass, of which one was given to each ; half for the present, the rest for a future meal. Pertap was stretched beside them pondering on his misfortunes, when a piercing cry from·his daughter roused him from reflection, a wild cat had darted on the reserved portion of food, and the agony of hunger made her shrieks in supportable...

He had beheld his sons and his Kindered fall around him on the field without emotion for this the Rajpoot was born ; but the lamentation of his children for food "Unmanned him.'

নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতাপের যোগ্য মন্ত্রী ভাম-শার

চারিত্রিক ঔদার্য, দেশপ্রেম তথা প্রভুভক্তির পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রেও 'রাজস্থান' গ্রন্থের অনুসরণ করেছেন। অর্থাভাবে যখন প্রতাপ বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন, তখন তাঁর সেই দুরবস্থার সময় ২৫০০০ সৈন্যের দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী ভরণ-পোষণের উপযোগী অর্থ ভাম-শা প্রতাপকে প্রদান করেছিলেন। এ তথ্য নাট্যকার টডের গ্রন্থ থেকেই নিয়েছিলেন। হলদিঘাটের যুদ্ধের বর্ণনায়ও নাট্যকারকে টডের বর্ণনার ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করতে দেখা গেছে। ঝালাপতি মান্নার অদ্বিতীয় প্রভুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ প্রতাপের রাজছত্র স্বীয় মস্তকে ধারণপূর্বক প্রতাপ-শত্রু মানসিংহ কর্তৃক মৃত্যু বরণের বৃত্তান্তটিও 'রাজস্থান' গ্রন্থেরই বর্ণিত বিষয়।

নাটকে সম্রাট আকবর-তনয় সেলিমকে উদারপ্রকৃতির ও সত্যানুরাগী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতাপের ভাই আকবরের পক্ষাবলম্বী শক্তসিংহ হলদিঘাটের যুদ্ধে নিঃসঙ্গ প্রতাপের অনুসরণকারী দু'জন মোঘল সৈন্যকে হত্যা করে প্রতাপের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। শক্তসিংহ সেলিমের কাছে উপরোক্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করলে সেলিম তাকে মার্জনা করেছিলেন। টড্ এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

On rejoining Selim, the truth of Sukta was greatly doubted when he related that Pertap had not only slain his pursuers, but his own steed, which obliged him to return on that of the Khorasani, Prince Selim pledged his word to pardon him if he related the truth ; when Sukta replied, "the burthen of a Kingdom is on my brother's shoulders, nor could I witness his danger without defending from it." Selim kept his word...

টডের বর্ণনানুযায়ী,

Sukta, whose personal enmity to Pertap had made him a traitor to Mewar.

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকে প্রতাপের বিরুদ্ধে তাঁর ভ্রাতা শক্তসিংহের শত্রুতার বিষয়ে উল্লেখ প্রসঙ্গে 'আহিরিয়া' উৎসব উপলক্ষে

দুই ভ্রাতার বরাহ শিকারে গমন এবং একটি বরাহ শিকারকে কেন্দ্র করেই উভয়ের মধ্যেকার শত্রুতার উদ্ভব বলে বর্ণনা করেছেন। টডের বর্ণিত 'আহিরিয়া' উৎসবের তাৎপর্য[৮] স্মরণে রেখেই নাট্যকার বরাহ শিকার প্রসঙ্গে প্রতাপের সঙ্গে শক্তসিংহের বিবাদের চিত্রটিকে অত্যন্ত নিপুণভাবে অঙ্কিত করেছেন। বলাবাহুল্য, যেহেতু এদিনের শিকারের সাফল্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের শুভাশুভের প্রশ্ন জড়িত, সেইজন্যই বরাহ হত্যার ব্যাপারে নাটকে শক্তসিংহ ও প্রতাপসিংহ—উভয়কে স্বীয় স্বীয় দাবীতে অটল থাকতে দেখা গেছে।

বিকানীর রাজকুমার পৃথ্বীরাজের চরিত্রটিও নাট্যকার টডের অনুসরণেই অঙ্কিত করেছেন লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকার পৃথ্বীরাজকে একই সঙ্গে বীর এবং একজন প্রসিদ্ধ কবিরূপে চিত্রিত করেছেন। নাটকের প্রথম অঙ্কের একস্থানে পৃথ্বীরাজকে বলতে দেখা গেছে—

> "—আমার রাজ্য গেছে, সব গেছে, আমি আর প্রতাপকে কি করে সাহায্য করব—আমার এখন এক কবিতা মাত্র সম্বল, মাঝে মাঝে আমি গোপনে তাঁকে কবিতা লিখে উৎসাহিত করবার জন্য চেষ্টা করি এইমাত্র—"

টডও তাঁর বর্ণনায় বলেছেন ঃ

PrithwiRaj was one of the most gallant chieftains of the age

৮ The Ahairea is therefore called the Mahoorut ca Sikar, or the chase fixed astrologically. As their success on this occasion is ominous of future good, no means are neglected to secure it either by scouts previously discovering the lair, or the desperate efforts of the hunters to slay the boar when roused. With the sovereign and his sons all the chiefs sally forth, each on his best steed, and all animated by the desire to surpass each other in acts of powers and dexterity etc.

(Annals and Antiquities of Rajasthan by Tod ; Chap XXI ; Page 448—49 ; Vol—I)

and like the Troubadour princes of the west, could grace a cause with the soul inspiring effusions of the muse, as well as aid it with his sword.

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে পৃথ্বীরাজের যে পত্রকবিতাটি সংযোজিত হয়েছে—

হিন্দুর ভরসা—আশা হিন্দুর উপর।
সে আশারো পরে রাণা ছেড়েছে নির্ভর।
প্রতাপ ছিলে গো ভাগ্যি—নচেৎ আকবর
করেছিল সমভূমি—সব একাকার।
ক্ষত্রিয় বীরের আর কোথা সে বিক্রম ?
মহিলারো কোথা এবে সতীত্ব সম্ভ্রম ?
যথার্থ সে রাজপুত—"নয় রোজা" দিনে
বিসর্জ্জিতে পারে কি গো আপন সম্ভ্রমে ?
কিন্তু বল কয়জন করেনি বিক্রয়,
সেই সে অমূল্য-ধন খেয়ে লজ্জাভয় ?
ক্ষত্রিয়ের মুখ্য-ধন বেচিল ক্ষত্রিয়
বিকাবে সে রত্ন কি গো চিতোর তুমিও ?

* * *

বিশ্বজন জিজ্ঞাসিছে "কোন্ গুপ্ত বলে
এড়ালেন মহারাণা শত্রুর কৌশলে ?"
নাহি প্রতাপের—শোনো—অন্য কোন বল,
হৃদয়ের বীর্য্য আর কৃপাণ সম্বল। ইত্যাদি।

—তারও মূলে রয়েছে টড্ কৃত পৃথ্বীরাজ রচিত একটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ ঃ

The hopes of the Hindu rest on the Hindu ; Yet the Rana forsakes them. But for Pertap, all would be placed on the

same level by Akber; for our chiefs have lost their valour and our females their honour. Akber is the broker in the market of our race, all has he purchased but the son of Oodoh; he is beyond his price. What true Rajpoot would part with honour for nine days (Noroza) yet how many have bartered it away? will Cheetore come to this market, when all have disposed of the chief article of the Khetri?......Despair has driven many to this mart, to witness their dishonour: from such infamy the descendant of Hamir alone has been preserved. The world asks, whence the concealed aid of Pertap? None but the soul of manliness and his sword: with it, well has he maintained the Khetri's pride. etc.

অতএব এরপর নাটকটির ঐতিহাসিকত্ব বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য, 'একে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না, পাত্রপাত্রীর নাম ইতিহাস থেকে গৃহীত বটে, কিন্তু নাট্যোল্লিখিত ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ কম'[১] —যথার্থ বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

৪

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থেকে বাংলা ঐতিহাসিক নাটক রচনার যে বিশেষ ধারার সূত্রপাত ঘটে, তা সার্থক পরিণতি লাভ করে দ্বিজেন্দ্রলালের হাতেই। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রায় সর্বজন স্বীকৃত। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকারগণের ন্যায় তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে টড্ প্রণীত 'রাজস্থান' গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়কে অবলম্বন করেছিলেন। টডের গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় অবলম্বনে সর্বাধিক নাটক রচনার কৃতিত্বও একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালেরই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত নাট্যকারগণের

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ: সুশীল রায়; পৃষ্ঠা—১৫০।

মধ্যে ইতিহাসের বিশ্বস্ত অনুসরণ একমাত্র গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকেই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়ে থাকে। তারপরই উল্লেখ করতে হয় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের নাম। দ্বিজেন্দ্রলালের ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য, 'কি ঘটনা বিন্যাসে কি নামকরণে কি সংলাপে কি চরিত্র চিত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের বিন্দুমাত্র মর্যাদা রাখেন নাই'[১০]—সর্বাংশে মেনে নেওয়া যায় না। একথা ঠিক যে, তাঁর নাটকে কল্পনার স্থান নেহাৎ কম নয়। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে তুলনামূলক বিচারে ইতিহাস অপেক্ষা কল্পনার স্থান যেমন অনেক বেশী লক্ষ্য করা যায়, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে তেমনটি লক্ষিত হয় না। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নাট্যকার ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন এবং যেখানে ইতিহাসকার নীরব, কেবলমাত্র সেইখানে ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি কাল্পনিক ঘটনা অথবা চরিত্রের সংযোজন করেছেন।[১১]

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাই' (১৯০৩) টড্ প্রণীত 'রাজস্থান' অবলম্বনেও নাট্যকার রচিত এটি প্রথম নাটক। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন, 'এই নাটকের উপাদান টড্ প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত হইল। পৃথ্বীরাজ ও তারার কাহিনী এখনও রাজস্থানে চারণ কবিদ্বারা রাজপুতদিগের মনোরঞ্জনার্থে গীত হইয়া থাকে।

১০. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; ডঃ সুকুমার সেন প্রণীত ; পৃঃ ৩৬৮ ; ৫ম সংস্করণ।

১১. 'তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতি সাবধানতার সহিত লিখিত। কোনস্থানেই তিনি ইতিহাসকে একেবারে অতিক্রম করেন নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব, মাত্র সেখানে তাঁহার মোহিনী কল্পনা অতি নিপুণতার সহিত বর্ণপাত করিয়াছে।' দ্বিজেন্দ্রলাল ; দেবকুমার রায়চৌধুরী ; পৃঃ ৭৫৪।

আশ্চর্যের কথা এই যে, এই মহিমাময়ী কাহিনী অদ্যাবধি কোন বঙ্গীয় নাটকের বিষয়ীভূত হয় নাই।'

—এইজন্যই নাট্যকার স্বয়ং পৃথ্বীরাজ ও তারার কাহিনী অবলম্বনে নাট্যরচনায় প্রয়াসী হন। নাট্যকার এই নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে 'রাজস্থানে' বর্ণিত বিবরণের অবিকল অনুসরণ করেন নি। অবশ্য নাট্যকার স্বয়ংই এ প্রসঙ্গে নাটকের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, 'আমি যদিও এ নাটকের মূল বৃত্তান্ত "রাজস্থান" হইতে লইয়াছি, তথাপি অপ্রধান ঘটনা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইতিহাসের সহিত এই নাটকের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। এই অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না। কারণ, নাটক ইতিহাস নহে।'

বস্তুতঃ, 'তারাবাই' নাটকে নাট্যকার একদিকে যেমন 'রাজস্থানে' বর্ণিত বিবরণের অনুসরণ করেছেন, তেমনি অপরদিকে অনেকক্ষেত্রে নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত চরিত্র এবং ঘটনার সংযোজনও লক্ষ্য করা যায়।

নাটকের মুখ্য পুরুষ চরিত্রগুলির সব ক'টিই 'রাজস্থান' গ্রন্থানুসরণে চিত্রিত। মেবারের রাণা রায়মল, রায়মলের ভ্রাতা সূর্যমল, রাণার তিনপুত্র যথাক্রমে সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল; সিরোহীর রাজা প্রভুরাও, পলায়িত তোড়া-অধিপতি শূরতান ও সৈন্যাধ্যক্ষ সারঙ্গদেব —এই সব ক'টি চরিত্রই ঐতিহাসিক। কিন্তু স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র সূর্যমলের স্ত্রী তারাবাইয়ের চরিত্রটিই ঐতিহাসিক।

নাটকে রাণার তিনপুত্রের মধ্যে বিবাদের কারণ স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে—জীর্ণ, রুগ্ন শয্যাগত রাণা রায়মল মৃত্যুমুখে পতিত হবার ভান করলে তৎক্ষণাৎ পৃথ্বীরাজ সঙ্গের সঙ্গে মেবারের ভাবী উত্তরাধিকারীর দাবীর মীমাংসাকল্পে তরবারি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাণা ছলনা ত্যাগ করে ক্ষুব্ধ চিত্তে বিবদমান পৃথ্বীরাজকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। সঙ্গকে বঞ্চিত করে

রাণা জয়মলকেই মেবারের ভাবী রাণা রূপে মনোনীত করেন। 'রাজস্থানে' কিন্তু মেবারের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী প্রসঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত এক চারণীর ভবিষ্যৎবাণীকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল দেখা যায়। নিজেদের ভবিষ্যৎ জানার অভিপ্রায়ে খুল্লতাত সূর্যমল সমভিব্যাহারে রাজপুত্রত্রয় এক চারণীর নিকট উপস্থিত হলে—

Scarcely had Prithiraj disclosed their errand, when the sibyl pointed to the panther—hide as the decision Omen of sovereignty to Sanga, with a portion to his uncle........ Prithiraj drew his sword and would have falsified the Omen, had not Surajmall stepped in and received the blow destined for Sanga, while the Prophetess fled from their fury. Surajmall and Prithiraj were exhausted with wounds, and Sanga fled with five sword-cuts and an arrow in his eye, which destroyed the sight forever.

—এবং রাণা এই সংবাদ অবগত হয়ে পৃথ্বীরাজকে নির্বাসিত করেছিলেন। অর্থাৎ রাণার মৃত্যুমুখে পতিত হবার ছলনা করে পুত্রদের পরীক্ষা করার ব্যাপারটি নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত। অবশ্য চারণী কর্তৃক মেবারের ভাবী রাণা হিসাবে সঙ্গের উল্লেখ নাটকেও রয়েছে।

রাজ্য থেকে বিতাড়িত পৃথ্বীরাজ নাড়োলে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কিছু উপকরণ সংগ্রহের জন্য নিজের অঙ্গুরীয়টি এক বণিকের কাছে বিক্রয় করতে গেলে পৃথ্বীরাজের প্রকৃত পরিচয়টি উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত স্বীয় বাহুবলে পৃথ্বীরাজ মীনরাজ্যের অধিকারী হন।—এ সকল বিবরণ 'রাজস্থান' থেকেই গৃহীত।

বৃদ্ধরাণা রায়মলের বিরুদ্ধে সারঙ্গদেবের সহযোগিতায় সূর্যমলের বিদ্রোহ এবং সেই বিদ্রোহ দমনে পুনরায় পৃথ্বীরাজের মেবারে

উপস্থিতি ঘটেছে। নাটকে সূর্যমলের চরিত্রটিকে অধিকতর বীর্যবান ও মাধুর্যমণ্ডিত করার অভিপ্রায়ে বিদ্রোহী সূর্যমল কর্তৃক তাঁর বিদ্রোহ বিষয়ে নির্বাসিত রাজকুমার পৃথ্বীরাজের উদ্দেশে পত্রপ্রেরণ এবং তাকে বৃদ্ধরাণার পক্ষাবলম্বনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন—নাট্যকারের স্বাধীন কল্পনার পরিচয় বাহী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সূর্যমল এবং তাঁর স্ত্রী তমসা চরিত্র দুটি ম্যাকবেথ এবং লেডি ম্যাকবেথের প্রভাবে প্রভাবিত। এমন কি সূর্যমলের মেবার রাজ্যলাভের উচ্চাশা পোষণের ব্যাপারে তমসার ইন্ধনদান 'রাজস্থান' বহির্ভূত বিষয়। অবশ্য যুদ্ধ অন্তে আহত খুল্লতাতের সংবাদ গ্রহণের অভিপ্রায়ে সূর্যমলের শিবিরে পৃথ্বীরাজের উপস্থিতি এবং ক্ষুধার্ত পৃথ্বীরাজের সূর্যমলের শিবিরে আহার্য গ্রহণের বিষয় 'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে। টড্ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন:

'It will show the manners and feelings so peculiar to the Rajpoot, to describe the meeting between the rival uncle and nephew,—Unique in the details of strife, perhaps, since the origin of man'.

পৃথ্বীরাজের হস্তে সারঙ্গদেবের মৃত্যুবরণ এবং পৃথ্বীরাজ কর্তৃক কালীমূর্তিকে মৃত সারঙ্গদেবের রক্তদানের বিষয়টি 'রাজস্থান' থেকে সংগৃহীত।—

There was a small temple near the stockade, to which in the morning Prithiraj requested his uncle to accompany him to sacrifice to kali, but the blow of the preceding night prevented him. Sarangdeo was his proxy. One buffalo had fallen, and a goat was about to follow, when the Prince turned his sword on Sarangdeo. The combat was desperate; but Prithiraj was the victor, and the head of the traitor was placed as an offering on the altar of time.

—নাটকে অবশ্য কালীমন্দিরে যাওয়ার ব্যাপারে পৃথ্বীরাজ কর্তৃক সূর্যমলকে অনুরোধ জ্ঞাপনের বিষয়টি অনুপস্থিত। বরং সারঙ্গদেবের

সূর্যমলের প্রতিনিধি স্বরূপ কালীমন্দিরে উপস্থিত হওয়ার কথাই উল্লিখিত হয়েছে।

পলায়িত তোড়া অধিপতি শূরতানের কন্যা তারাবাই; যার নামানুসারে আলোচ্য নাটকটির নামকরণ করা হয়েছে, তার পাণি-গ্রহণের শর্ত স্বরূপ নির্দিষ্ট হয়েছিল তোড়ার পুনরধিকার। মোহমুগ্ধ রাজকুমার জয়মল তোড়া পুনরধিকার ব্যতিরেকেই তারাবাইকে লাভের আশায় অগ্রসর হলে ক্ষুব্ধ শূরতানের হস্তে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। রাণা রায়মল এই সংবাদ অবগত হয়ে শূরতানের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে দুষ্কৃতকারী সন্তানের উপযুক্ত শাস্তি বিধানে সন্তুষ্ট হয়ে শূরতানকে একখণ্ড রাজ্য দান করেছেন। নাটকে বর্ণিত এই বিষয়গুলি 'রাজস্থান' গ্রন্থানুসরণেই উল্লিখিত হয়েছে।

জয়মলের শোচনীয় মৃত্যুবরণের পর তোড়া পুনরধিকারের দ্বারা পৃথ্বীরাজ কর্তৃক শূরতান অধিপতির কন্যা তারাবাইয়ের পাণিগ্রহণও টড্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

শিরোহির অধিপতির সঙ্গে রাণা রায়মল তাঁর এক কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু শিরোহী অধিপতি রাণার কন্যার ওপর অকথ্য নির্যাতন করায় পৃথ্বীরাজ আপন ভগ্নীপতিকে সমুচিত শাস্তি দান করেন। অপমানিত শিরোহির অধিপতি প্রতিশোধ গ্রহণার্থে শেষ পর্যন্ত পৃথ্বীরাজকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। নাটকে পৃথ্বীরাজের বিষ প্রয়োগে মৃত্যু বর্ণিত হলেও এক্ষেত্রে নাট্যকার কিছু পরিমাণে স্বাধীন কল্পনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন লক্ষ্য করা যায়।

তথ্যানুরক্তি প্রসঙ্গে বিশেষ করে দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) নাটকটির উল্লেখ করতে হয়। তাঁর পূর্বে গিরিশচন্দ্র প্রতাপসিংহের জীবন অবলম্বনে 'রাণা প্রতাপ' নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্র নাটকটি শেষ করেন নি। গিরিশ-চন্দ্রের পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'অশ্রুমতী' নাটকে রাণা প্রতাপের

জীবনের কিয়দংশকে চিত্রিত করেছেন সত্য, কিন্তু এ নাটকে ইতিহাস অপেক্ষা কল্পনার আতিশয্য অনেক বেশি। অতুলনীয় আত্মত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত রাণা প্রতাপের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটিকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেই।

নাটকে প্রতাপসিংহ কর্তৃক কালীমূর্তির সম্মুখে রাজপুত সর্দারদের শপথ গ্রহণ করানোর যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, তা টডের অনুসরণেই। রাজপুত সর্দারেরা চিতোর উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ভুর্জ্জপত্রে ভক্ষণ, তৃণশয্যায় শয়ন, মোঘলের সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন না করা প্রভৃতি বিষয়ে শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছেন। টডের গ্রন্থেও এই ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে :

......Pertap interdicted to himself and his successors every article of luxury or pomp, until the insignia of her glory should be redeemed. The gold and silver dishes were laid aside the for pateras of leaves ; their beds henceforth of straw, and their beards left untouched. But in order more distinctly to mark their fallen fortune and stimulate to its recovery, he commanded that the martial nakaras, which always sounded in the van of battle or processions, should follow in the rear.

নাটকে বর্ণিত হয়েছে, মেবারের ওপর আপন অধিকার রক্ষায় অসমর্থ রাণা শেষ পর্যন্ত এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। সমগ্র মেবারকে তিনি পরিত্যক্ত প্রান্তরে করেছিলেন পরিণত। গ্রামবাসীদের পর্বতদুর্গে আশ্রয় গ্রহণে করেছিলেন বাধ্য। পরিণামে সমগ্র জনপদ হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে হয়েছিল পরিণত। প্রতাপের উদ্দেশ্য ছিল যাতে সম্রাট আকবর মেবার অধিকার করলেও মেবার থেকে এক কপর্দকও সংগ্রহ করতে সমর্থ না হন। এইরূপে রাণা, আকবরের মেবার অধিকার ব্যর্থতায় পর্যবসিত

করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রতাপের এতাদৃশ পরিকল্পনার সমর্থন টডের বর্ণনাতেও মেলে—

......being unable to keep the field in the plains of Mewar, he followed the system of his ancestors, and commanded his subjects, on pain of death, to retire into the mountains. During the protracted contest, the fertile tracts watered by the Bunas and the Beris, from the Aravali chain west to the eastern tableland, was be cheragh 'without a lamp'......The silence of the desert prevailed in the plains ; grass had usurped the place of the waving corn; the high ways were choked with the thorny babool, and beasts of prey made their abode in the inhabitants of his subjects.

এমন কি, রাণার নির্দেশ অমান্য করে এক মেষরক্ষক চিতোর দুর্গ পার্শ্বস্থ উপত্যকা ভূমিতে মেষ চারণে রত হলে ক্রুদ্ধ রাণার নির্দেশে তার হত্যার যে ঘটনাটি নাটকে বর্ণিত হয়েছে, তারও সমর্থন মেলে টডের গ্রন্থে—

In the midst of this desolation, a single goat herd, trusting to elude observation, disobeyed his prince's injunction, and pastured his flock in the luxuriant meadows of ontalla, on the banks of the Bunas. After a few Questions, he was killed and hung up in terrorem.

'রাজস্থানে' বর্ণিত হয়েছে যে সোলাপুর যুদ্ধে জয়লাভের পর হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তনকালে রাজা মানসিংহ স্বেচ্ছায় রাণা প্রতাপের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন কমলমীরে। নাটকেও মানসিংহের স্বেচ্ছায় আতিথ্য গ্রহণের বৃত্তান্তটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তা এক বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে। মানসিংহ রাণা প্রতাপের জ্যেষ্ঠপুত্র অমরসিংহের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু টডের গ্রন্থে মানসিংহের এতাদৃশ অভিপ্রায় বর্ণিত হয়নি। তবে মানসিংহের আহারের সময় রাণা প্রতাপের ইচ্ছাপূর্বক অনুপস্থিতি

জনিত বিরোধের প্রসঙ্গটি নাট্যকার টডের বর্ণনানুসরণেই উপস্থাপিত করেছেন। পরাজিত প্রতাপের শোচনীয় দুরবস্থা, মন্ত্রী ভীম সাহা (ভাম সা) কর্তৃক প্রতাপকে অর্থদান[১২]; মৃত্যুকালে বিলাসী পুত্র অমরসিংহের ভবিষ্যত আচরণ তথা আদর্শ সম্বন্ধে রাণার সংশয় ও মানসিক যন্ত্রণাভোগ, বিশ্বস্ত ভীলগণ কর্তৃক প্রতাপের অসময়ে সাহায্য দান,[১৩] হলদিঘাটের যুদ্ধে বিশ্বস্ত মানা কর্তৃক প্রতাপের জীবন রক্ষা,[১৪] বিশ্বাসী প্রভুভক্ত ঘোড়া চৈতকের সাহায্যে হলদিঘাটের রণাঙ্গন থেকে প্রতাপের নিরাপদস্থানে প্রত্যাবর্তন এবং অতঃপর চৈতকের মৃত্যুবরণ প্রভৃতি বিষয়গুলি নাট্যকার 'রাজস্থান' অনুসরণেই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু পরিবর্তনও লক্ষিত হয়ে থাকে।

নাটকে সম্রাট আকবরের চরিত্রের কামাতুর দিকটি চিত্রিত করা হয়েছে। পৃথ্বীরাজ সম্রাটের অজস্র গুণগানে নিমগ্ন হলে তাঁর পত্নী যোশা সম্রাটের ইন্দ্রিয় লালসার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যোশীর ভাষায়ঃ

'আর এই ছুরি যদি আমার সহায় না থাকতো, তা হলে তোমার স্ত্রী এতক্ষণ আকবরের সহস্রাধিক বারাঙ্গণার অন্যতম হোত!'

১২. নাটকে এই অর্থের পরিমাণ বলা হয়েছে বিংশতি সহস্র সেনার চোদ্দ বৎসরের বেতনের সমতুল। কিন্তু 'রাজস্থানে' দেখা যায় এই অর্থের পরিমাণ, 'equivalent to the maintenance of twenty—five thousand men for twelve years.'

১৩. On one occasion they (প্রতাপ ও তাঁর পরিবার) were saved by the faithful Bhils of cavah, who carried them in wicker baskets and concealed them in the tin mines of Jawura, where they guarded and fed them.—Tod

১৪. নাটকে মানা কর্তৃক প্রতাপের মস্তকস্থিত উষ্ণীষ গ্রহণের বিষয় বর্ণিত হলেও 'রাজস্থানে' রাজছত্র গ্রহণের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

(চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য) —আপাতদৃষ্টিতে সম্রাটের এতাদৃশ চরিত্র চিত্রণ অনৈতিহাসিক বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। নাট্যকারের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য :

'অনেকে ভাবিবেন যে এ গ্রন্থে আমি সম্রাট আকবরের চরিত্র মূল হইতে অন্যায় রূপে বিকৃত করিয়াছি। তাহা করি নাই, আকবরের চরিত্র আমি ঐরূপই বুঝিয়াছি।'

এইবার আকবরের এরূপ চরিত্র চিত্রণের মূলটির সন্ধান করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য, নাট্যকার এক্ষেত্রেও টডের বর্ণনার ওপরেই নির্ভর করেছেন—

On one of these celebrations of the khooshroz the monarch of the Moguls was struck with the beauty of the daughter of Mewar, and he singled her out from amidst the united fair of Hind as the object of his passion. It is not improbable that an ungenerous feeling united with that already impure, to despoil the Seesodias of their honour, through a princess of their house under the protection of the sovereign. On retiring from the fair, she found herself entangled amidst the laby rinth of apartments by which egress was purposely ordained, when Akbar stood before her : but instead of acquiescence, she drew a poniard from her breast, dictating, and making him repeat, the oath of renunciation of the infamy to all her race.

খোরাসান এবং মূলতান পতি কর্তৃক আক্রান্ত প্রতাপকে শেষ পর্যন্ত তাঁর ভ্রাতা শক্তসিংহ রক্ষা করেন। শক্তসিংহের হাতে খোরাসান এবং মূলতানপতি নিহত হন। অবশেষে এতাদৃশ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শক্তসিংহ সেলিমের পদাঘাত ও অপমান লাভ করেছেন, সর্বোপরি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কারাগারে। পরিশেষে আকবর তনয়া সাহাজাদী মেহের কর্তৃক শক্ত কারাগার থেকে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েছিলেন বলে নাটকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু

এক্ষেত্রে টডের বর্ণনার সঙ্গে নাট্যকারের বর্ণনার কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়ে থাকে। টডের বর্ণনায় দেখা যায় শক্তসিংহ সেলিমের কাছে আনুপূর্বিক সব সত্য ঘটনা বিবৃত করায় সেলিমই তাঁকে মার্জনা করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' নাটকে কিন্তু এই বিষয়টি টডের ঘনিষ্ঠ অনুসরণেই বর্ণিত হতে দেখা গেছে।

জীবনের শেষের দিকে প্রতাপ তাঁর রাজ্যের অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাটকে বর্ণিত হয়েছে শক্তসিংহ মানসিংহের প্রধান বাণিজ্য নগরী মালপুরা লুঠ করেছেন। প্রতাপ-সিংহ কমলমীর অধিকার করে সেখানে দুর্গ নির্মাণ করতে শুরু করেছেন; উদিপুরও রাণার করতলগত হয়েছে। প্রতাপের ভাষায় 'পুনরুদ্ধার বাকি মাত্র চিতোর, আজমীর আর মণ্ডল গড়ে'র। 'রাজস্থানে'ও বর্ণিত হয়েছে—

In one short campagin (S. 1586, A. D. 1530), he had recovered all Mewar, except cheetore, Ajmeer, and Mandal gurh and determining to have a slight ovation in return for the triumph Raja Maun had enjoyed, he invaded Ambar, and sacked its chief mart of commerce, Malpura.

পরিশেষে নাটকে বর্ণিত শক্তসিংহের জীবনী ও প্রতাপের সঙ্গে শক্তের বিরোধের কারণটির উল্লেখ করা যেতে পারে। শক্তসিংহ যখন মাত্র পাঁচ বছরের বালক, সেই সময়ে একদিন একখানি ছুরিকার ধার পরীক্ষা কল্পে বালক শক্ত নিজের হাতেই অম্লানবদনে তা বসিয়েছিলেন। এদিকে শক্তের কোষ্ঠী পত্রে ছিল যে তিনিই ভবিষ্যতে জন্মভূমির অভিশাপ রূপে হয়ে উঠবেন। বালকের পূর্বোক্ত দুঃসাহসিকতার পরিচয় পেয়ে পিতা উদয়সিংহ কোষ্ঠীপত্রের বক্তব্যে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে বালককে হত্যার আদেশ দেন। এদিকে নিঃসন্তান সালুম্ব্রাধিপতি গোবিন্দসিংহ শক্তকে তাঁর ভাবী উত্তরাধিকারী করার মানসে রাণার কাছে তার প্রাণভিক্ষা চেয়ে নেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ

গোবিন্দসিংহ শক্তসিংহকে গ্রহণ করার পরে তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তখন প্রতাপ মেবারের রাণা। শেষে সালুম্ব্রাধিপতির অনুরোধে শক্ত প্রতাপের নিকট আশ্রয় লাভ করেন। অতঃপর একদিন শিকার উপলক্ষে দুই ভাইয়ের মধ্যে তীব্র বিরোধ উপস্থিত হয়। একজন অপরজনের প্রতি যখন অস্ত্রাঘাতে উদ্যত, এমন সময় কুলপুরোহিত সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব নিরসন কল্পে স্বয়ং অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। ক্ষুব্ধ প্রতাপ এই ব্রাহ্মণ হত্যার জন্য সম্পূর্ণরূপে শক্তকেই দায়ী করেন এবং অনতিবিলম্বে তাকে রাজ্য পরিত্যাগের নির্দেশ দেন। প্রতাপ কর্তৃক বিতাড়িত শক্ত প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্য সম্রাট আকবরের পক্ষে যোগদান করেন। এইরূপে উভয়ের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক হয় স্থাপিত। শেষ পর্যন্ত হলদিঘাটের যুদ্ধে খোরাসান ও মুলতান পতিকে হত্যা করে নিঃসঙ্গ প্রতাপের প্রাণ রক্ষার মাধ্যমে শক্তসিংহের সঙ্গে প্রতাপের দীর্ঘকালের বৈরিতার ঘটে অবসান। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল উপরোক্ত ঘটনা সকল বর্ণনার ব্যাপারেও টডের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন লক্ষ্য করা যায়।

সমালোচকের মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়, 'তথ্যানুরক্তি ও ঐতিহাসিক বিশুদ্ধির দিক থেকে এই নাটককে ত্রুটিহীন বলা যায়।'[১৫]

দ্বিজেন্দ্রলালের মোঘল রাজপুত ইতিহাস কেন্দ্রিক নাটকগুলির উপাদান প্রধানতঃ টডের 'রাজস্থান' থেকেই সংগৃহীত। অবশ্য ঐতিহাসিক উপকরণের বিচারে দ্বিজেন্দ্রলালের এই পর্যায়ের সব কয়টি নাটকই যে সমান ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভের অধিকারী, তা নয়। বিশেষ এক আদর্শ প্রচারের প্রবণতা এবং সর্বোপরি তীব্র

---

১৫. দ্বিজেন্দ্রলাল: কবি ও নাট্যকার—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়; পৃঃ ২৮৬।

যশোবন্ত সিংহের বিধবা মহিষীর যে বীরাঙ্গনা রূপটি নাটকে চিত্রিত হয়েছে, তা স্বভাবতঃই আমাদের শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক করে থাকে। স্বামী হত্যাকারী মোঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে মাড়বার ও মেবারকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁকে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে। শিশুপুত্র অজিত সিংহকে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রেরণ করে বিধবা মহিষী রাঠোর জাতিকে মোঘল সম্রাটের প্রতিরোধে উত্তেজিত এবং অনুপ্রাণিত করেছেন। টডের বর্ণনায়ঃ

The child was sent to reside at kailwa under the safeguard of the brave Durgadas, while the mother returned to Marwar to foster the spirit of resistance amongst the Rathor clans. A unity of interests was thus cemented between these two powerful states such as had never existed between them before ;

নাটকের জয়সিংহ চরিত্রটিও ইতিহাসাশ্রিত। জয়সিংহের স্ত্রৈণভাব, রাজকার্যে ঔদাসীন্য 'রাজস্থানে'ও উল্লিখিত হয়েছে। জয়সিংহের একাধিক রাণীর উল্লেখ টডও করেছেন। তবে 'কমলা'[১৮] নামটি 'রাজস্থানে' উল্লিখিত হলেও 'সরস্বতী' নামটি নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত। এমন কি ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে জয়সিংহের সন্ধি স্থাপন, অমরসিংহকে মন্ত্রীর অভিভাবকত্বে রেখে রাণী কমলার সঙ্গে অন্যত্র পৃথক প্রাসাদে বসবাস প্রভৃতি বিষয়ও 'রাজস্থান' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

নাটকে জয়সিংহ ও ভীমসিংহের জন্ম বৃত্তান্ত, মেবারের ভাবী রাণা রূপে রাজসিংহ কর্তৃক জয়সিংহের মনোনয়ন, সন্ধির শর্তস্বরূপ রাণার নিকট মোঘল সেনাপতি দিলীর খাঁর পুত্রদের গচ্ছিত রাখা, সম্রাটতনয় আকবরের প্রতি রাজপুত সৈন্যদের সমর্থন, শেষে আকবরের প্রতি রাজপুত সৈন্যদের সমর্থন বিনষ্ট করার অভিপ্রায়ে সম্রাটের

১৮ 'familiarly known as the Ruta Rani, or 'tasty queen.'-Tod.

পত্রপ্রেরণ, পরিশেষে আকবরের ব্রিটিশ জাহাজে পারস্য গমন—প্রভৃতি ঘটনাও 'রাজস্থান' থেকেই সংগৃহীত।

অপর পক্ষে ঔরঙ্গজেব মহিষী গুলনেয়ার, আকবর-দুহিতা রাজিয়া উৎ-উন্নিসা প্রভৃতির আচরণ ও ক্রিয়া-কলাপ কেবলমাত্র অস্বাভাবিকই নয়, সেই সঙ্গে অসঙ্গত, অস্বাভাবিক এবং অনৈতিহাসিকও বটে। তবে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার ইতিহাসকেই অনুসরণ করেছেন লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতনে' (১৯০৮) পূর্বোল্লিখিত রাজপুত-মুঘল কেন্দ্রিক নাটকগুলির তুলনায় আদর্শ প্রচারের প্রবণতা সর্বাপেক্ষা প্রকটরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। নাটকটি তাই একান্তভাবেই উদ্দেশ্য মূলক রচনায় পর্যবসিত। অবশ্য নাট্যকার স্বয়ংই ভূমিকায় নাটকে 'এক মহানীতি' প্রচারের সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন।

নাটকটি প্রসঙ্গে সর্ব প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রাণা প্রতাপের পুত্র অমরসিংহের কথা। নাটকে চরিত্রটিকে একান্তভাবে দৃঢ়তাহীন, যুদ্ধ-বিমুখ, শত্রুর সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হতে উদগ্রীব, আত্মমর্যাদা-হীন রাণা রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। যে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর পিতা রাণা প্রতাপের আজীবন সংগ্রাম কিংবদন্তীতে পরিণত, সেই অদ্বিতীয় রাণা প্রতাপের পুত্র অমরসিংহকে ব্যক্তিত্বহীন এবং নিছক রাজ্যের কল্যাণে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হতে আগ্রহী দেখে স্বভাবতঃই পাঠক দুঃখ অনুভব না করে পারে না। সেনাপতি বৃদ্ধ গোবিন্দসিংহ, মেবারের সামন্তগণ, চারণী সত্যবতী প্রমুখেরা বারংবার অমরসিংহকে মোঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে অনুপ্রাণিত করায় শেষ পর্যন্ত রাণা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ অমরসিংহ সম্বন্ধে সেনাপতি গোবিন্দ সিংহের উক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে :

'...সেই মেবারে সেই দেবতার কুটীরগুলি ভেঙে সম্ভোগের

নাট্যভবন নির্ম্মিত হতে দেখেছি। সেই মহাত্মার (রাণা প্রতাপের) মন্দির চূর্ণ করে তারই প্রান্তরে ঐশ্বর্যের প্রাসাদ গঠিত হ'তে দেখেছি। তাঁর সেই মহৎ, তাঁর সেই কীর্তি পবিত্র, তাঁর সেই জয়ধ্বনি মুখরিত শৈলচ্ছায়ে বিলাসের নিকুঞ্জবন রচিত হতে দেখেছি।[১৯]

'রাজস্থানে'ও অমরসিংহের এতাদৃশ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ লক্ষিত হয়ে থাকে। টড বলেছেন:

at one time seemed likely to bring about the realisation of his father's prophetic fears.[২০] Amra constructed for himself a palace on the banks of the lake, named after himself the 'abode of immorality', remarkable for its gothic contrast to the splendid marable edifice erected by his predecessors, and now the

abode of the princes of Mewar, yet a residence by no means devoid of stately luxury, and one ill calculated to foster the memory of his father's adomonitions.

কিন্তু এইখানেই অমরসিংহ সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হয়ে যায়নি। টড্ আরও বলেছেন:

All comment ts superfluous on such a character as that of Rana Amra. He was worthy of Pertap and his racc. He possessed the physical as well as the mental Qualities of a hero, and was the tallest and strongest of all the princes of Mewar

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, নাটকে নাট্যকার অমরসিংহের আংশিক চিত্রকেই রূপায়িত করেছেন। অতএব অমরসিংহ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য:

'অমরসিংহের চরিত্র পরিকল্পনায় নাট্যকার ঐতিহাসিক মর্যাদা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

---

১৯ 'মেবার পতন'; প্রথম অঙ্ক; ৩য় দৃশ্য।

২০ Pertap, who thence adopted the opinion that his son would never withstand the hardships necessary to be endured in such a cause.—Tod.

······ইতিহাসেও তাঁহার এই পরিচয় পাওয়া যায়।'[২১]

—সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

মোঘলের আশ্রিত অমরসিংহের জ্যেষ্ঠতাত সগরসিংহের চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার ঐতিহাসিক মর্যাদা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক সগর চিতোরের রাণা রূপে নিযুক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত তিনিই স্বয়ং চিতোরের অধিকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিত্যাগ করে অমরসিংহের উপর তা ন্যস্ত করে ফিরে গেলেন। এবং শেষে স্বয়ং সম্রাট সমক্ষে ছুরিকাঘাতে মৃত্যু বরণ করেন। 'রাজস্থানে'ও অনুরূপ বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়ঃ

Sugra, who abandoned Pertap and went over to Akbar, was selected ; the sword of sovereignty was girded on him by the emperor's own hands ; and, under the escort of a Mogul force, he took possession of his ruined capital.

Sugra, though flinty as the rock to a brother and a nephew, was unable to support the silent rebuke of the altars of the heroes of his race, and, at length, sending for Amra, he handed over to him cheetore, and himself retired to Rinthambur. Sometime after, upon going to court. and being upbraided by Jahangir, he drew his dagger and slew himself in the emperor's presence an end worth of such a traitor.

'মেবার পতন' নাটকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র রাণা প্রতাপের সুদীর্ঘ কালের পার্শ্বচর সালুম্ব্রাধিপতি গোবিন্দ সিংহ। স্বদেশ প্রেম, গভীর আত্মমর্যাদা বোধ, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সর্বোপরি সঙ্কল্পে তিনি অটুট। বস্তুতঃপক্ষে গোবিন্দসিংহ রাজপুত কুলগৌরব। নাটকে এঁর চরিত্রটিও টডের বর্ণনানুসরণেই চিত্রিত। মোঘলের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে রাণার ইতস্ততঃ আচরণে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত

২১. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস; ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩১৯।

গোবিন্দ সিংহের আয়না চূর্ণ করার ব্যাপারটিও টড্ বর্ণনা করেছেন :

A magnificent mirror of European manufacture adorned the embryo palace Animated with a noble resentment at the inefficacy of his appeal to the better feelings of his prince, the chieftain of Salumbra hurled the "slave of the carpet" against the splendid bauble, and, starting up, seized his sovereign by the arm and moved him form his throne.

মোঘল সেনাপতি আবদুল্লা, শাহজাদা পরভেজ প্রভৃতিদের সঙ্গে রাজপুত সৈন্যদের যুদ্ধের বর্ণনাতেও 'রাজস্থানে'র অনুসরণ লক্ষণীয়।

পরিশেষে নাটকের নারীচরিত্র গুলি সম্বন্ধে উল্লেখ করা যেতে পারে। মানসী, সত্যবতী এবং কল্যাণী চরিত্রত্রয়ে একই সত্তার ত্রিবিধ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ মানসী চরিত্রটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলেই প্রতিভাত হয়ে থাকে।

৫

টড্ রচিত 'রাজস্থান' গ্রন্থের বিষয় অবলম্বনে রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮)। যে টডের গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য অংশের উৎসরূপে পরবর্তীকালে গৃহীত হবে, তার প্রথম যে কাহিনী অবলম্বনে বাংলায় গ্রন্থ রচিত হল তা—পদ্মিনীর উপাখ্যান। পরবর্তীকালে নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এই কাহিনীটিকেই তাঁর 'পদ্মিনী' নাটকে (১৯০৬) করেন রূপায়িত।

সুবিশাল 'রাজস্থান' গ্রন্থ বহুবিধ চরিত্র এবং বৈচিত্র্যময় আখ্যানের আকর স্বরূপ। কিন্তু তবু তন্মধ্যে এমন দু'একটি চরিত্র

এবং ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা একাধিক কারণেই বিশেষ ভাবে আকর্ষণীয়। এইজন্য এই সকল চরিত্র ও আখ্যান অবলম্বনে একাধিক গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেছে। পদ্মিনীর উপাখ্যান 'রাজস্থান' গ্রন্থে বর্ণিত এমনই এক আকর্ষণীয় বিষয়—যা একাধিক কারণেই লেখকদের করেছে আকৃষ্ট।

অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী রাজা ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর প্রতি সম্রাট আলাউদ্দীনের প্রলোভন এবং তাঁকে লাভের আশায় নিজ শিবিরে আগত বৃদ্ধ রাজার প্রতি সম্রাটের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা। অতঃপর পদ্মিনী অসীম সাহসিকতার সঙ্গে কিরূপে রাজাকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন সে কাহিনী কেবলমাত্র চিত্তাকর্ষকই নয়, সেইসঙ্গে বিস্ময়করও বটে। এরপর প্রতারিত সম্রাট প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্য চিতোর আক্রমণ করলে চিতোর রক্ষার জন্য রাজপুতগণ সর্বস্ব পণ করে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করেও শেষ পর্যন্ত মাতৃভূমিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে অসমর্থ হলে পদ্মিনী সহ সকল ক্ষত্রিয় রাজপুত রমনী কঠিন জহরব্রতের অনুষ্ঠানে প্রাণ বিসর্জন দেন। বাস্তবিক চিতোর রক্ষার ব্যাপারে রাজপুত বীরগণের বীরত্ব রাজপুত ইতিহাসকে করে রেখেছে উজ্জ্বল। আর সেই সঙ্গে কঠিন জহরব্রতের ন্যায় গাম্ভীর্যময় ও বিষাদ ভারাক্রান্ত অনুষ্ঠানের বর্ণনা পদ্মিনীর উপাখ্যানকে করে তুলেছে অধিকতর আকর্ষণীয়। এই জন্যই কবিবর রঙ্গলাল এবং পরবর্তী কালে ক্ষীরোদ প্রসাদ বিশেষভাবে পদ্মিনীর উপাখ্যানকেই তাঁদের গ্রন্থের বিষয়বস্তু রূপে করেছিলেন নির্বাচিত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যিনি 'প্রতাপাদিত্যে'র[২২] মত নাটক রচনা করে জাতীয়ভাব প্রচার মূলক নাটক রচনার ক্ষেত্রে প্রথম প্রবর্তকের গৌরব লাভের হয়েছিলেন অধিকারী, তিনি যে স্বদেশী

২২. ১৯০৩।

ভাব প্রচারের মহত্তর উদ্দেশ্যেই 'পদ্মিনী'র মত নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র থাকতে পারেনা। এই প্রসঙ্গে বর্তমান আলোচনার ভূমিকায় বর্ণিত বক্তব্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে—উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলায় যে ঐতিহাসিক নাটক এবং উপন্যাস রচনার সুত্রপাত হ'ল, তার মূলে ছিল তৎকালীন স্বাদেশিক চেতনা। তাই মুখ্যতঃ রাজপুত বীরত্বের কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ পরাধীন ভারতবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে হয়েছিলেন প্রয়াসী। কবি রঙ্গলাল পদ্মিনীর আখ্যান বিষয়ক কাব্য রচনার ভূমিকাংশে বলেছেন:

"আমি এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরাণেতিহাস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম ইহার কারণ কি?—এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্ব্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষতঃ, ঐ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের উত্তাবৎ শ্রদ্ধাই নহে, এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যা-বুদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভুত রসাশ্রিত কাব্য প্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুর্ব্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধান কালাবধি-বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে এদেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদগুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের

অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্ব্বক রচিত করিলাম।"

—অনুরূপ বক্তব্য ক্ষীরোদপ্রসাদ স্বয়ং না প্রকাশ করলেও এই একই মানসিকতা তাঁর 'পদ্মিনী' নাটক রচনার ক্ষেত্রে যে কাজ করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের নাটকীয়তা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য: 'গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় ক্ষীরোদপ্রসাদ ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে যাইয়া ইতিহাসকে খুব বিশ্বস্তভাবে অনুবর্তন করেন নাই। অনেকস্থলেই তিনি নিজের প্রয়োজনমত কল্পনাশ্রয়ী হইয়া অভিনব ঘটনা এবং চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন'।[২৩] আমাদের আলোচ্য 'পদ্মিনী' নাটকটির ক্ষেত্রে কিন্তু সমালোচকের এতাদৃশ মন্তব্য তেমন প্রযোজ্য নয় বলেই স্বীকার করতে হয়। বরং নাট্যকার টডের বর্ণনার ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন লক্ষিত হয়ে থাকে।

নাটকে বর্ণিত হয়েছে, রাণা লক্ষ্মণসিংহের অনুপস্থিতির কালে সম্রাট আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর হয় আক্রান্ত। কিন্তু এই প্রথম আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে হল বিপর্যস্ত। অতঃপর উজীরকন্যা নসীবনের নিকট থেকে রাজা ভীমসিংহের মহিষী পদ্মিনীর অপরূপ সৌন্দর্যের কথায় সম্রাট পদ্মিনীকে দেখতে হয়েছেন প্রলুব্ধ। কিন্তু সম্রাটের সম্মুখে হিন্দুকুল কামিনীর উপস্থিতি অসম্ভব হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সম্রাট রাজা ভীমসিংহ প্রস্তাবিত দর্পণে প্রতিফলিত পদ্মিনীর অপরূপ রূপ-লাবণ্য প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পদ্মিনীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছেন। অতিথিপরায়ণ বিশ্বাসী ভীমসিংহ সম্রাটকে তাঁর শিবির পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেলে বিশ্বাসঘাতক সম্রাট কর্তৃক হয়েছেন

---

২৩ অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ; বাংলা নাটকের ইতিহাস; ৫ম সংস্করণ; পৃষ্ঠা ৩০৪।

অন্তরীণ। এবং রাজার মুক্তিপণ স্বরূপ সম্রাট পদ্মিনীকেই করেছেন দাবী।

—এই প্রসঙ্গে 'রাজস্থানে'র বর্ণনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

The Hindu bard recognizes the fair, in preference to fame and love of Conquest, as the motive for the attack of Alla-o-din, who limited his demand to the possession of Pudmini; though this was after a long and fruitless seize. At length he restricted his desire to a more sight of this extraordinary beauty, and acceded to the proposal of beholding her through the medium of mirrors. ......The Rajpoot, unwilling to be outdone in confidence, accompanied the King to the foot of the fortress, amidst many Complimentary excuses from his guest at the trouble he thus occasioned. ......Here he had an ambush; Bheemsi was made prison, hurried away to the Tatar Camp, and his liberty made dependent on the surrender of Pudmini.

শেষপর্যন্ত কিরূপ কৌশলে রাজা ভীমসিংহ সম্রাটের কবল থেকে মুক্ত হয়েছেন নাটকে তা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রেও নাট্যকার টডের বর্ণনাকেই ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন। এমনকি নাটকে রাণা কর্তৃক চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দর্শনলাভ এবং দেবী কর্তৃক রাজকুমারদের আত্মবলিদানের নির্দেশ দানের প্রসঙ্গটিও টডের অনুসরণেই রচিত। অবশ্য টড্ যেখানে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর একাধিকবার আবির্ভাব এবং চিতোরে তাঁর অবস্থানের শর্তস্বরূপ রাজপুত্রদের আত্মবলিদানের নির্দেশদান বিষয়ে বর্ণনা করেছেন, সেক্ষেত্রে নাটকে এই প্রসঙ্গ একবার মাত্র বর্ণিত হয়েছে। তবে অতিরিক্ত সংযোজন হিসাবে নাটকের একেবারে সমাপ্তির সময়ে চিতোর-ঈশ্বরীর ছায়ামূর্তির আবির্ভাব উল্লিখিত হয়েছে।

স্বদেশভূমি রক্ষার্থে আত্মবলিদানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুখ্যতঃ অরুণসিংহ এবং অজয়সিংহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে 'রাজস্থান' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নাটকে অজয়সিংহের পরিবর্তে পদ্মিনীর ভ্রাতুষ্পুত্র

বালক বাদলের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। টডের বর্ণনার সঙ্গে নাটকের বর্ণনার অপর একটি পার্থক্যের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। টড্ অজয়সিংহকে রাণার আপন সন্তান বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু নাটকে অজয়সিংহকে মহারাজ ভীমসিংহের পুত্র বলে বলা হয়েছে। তবে উভয়ক্ষেত্রেই অজয়সিংহ যে মহারাণার বিশেষ প্রিয়পাত্র তা লক্ষ্য করা যায়।

আত্মসম্মান রক্ষার্থে পুরনারীবৃন্দের কঠিন জহরব্রতানুষ্ঠানের বিষয়ও টডের বর্ণনানুগত। টডের গ্রন্থে শিকার উপলক্ষে অরুণসিংহের সঙ্গে এক চৌহান বংশীয় রমণীর (daughter of a poor Rajpoot of the Chundano tribe—one of the branches of the Chohan) সাক্ষাৎকার এবং পরিশেষে উভয়ের মধ্যেকার বিবাহ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটকীয় বৈচিত্র্য ও সেইসঙ্গে সম্ভবতঃ নাটকের কলেবর বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে এই কাহিনীটিকে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করে এক মনোরম উপভোগ্য রোমান্টিক আখ্যানে করেছেন রূপান্তরিত।

নাটকে পদ্মিনীর যে পিতৃপরিচয় প্রদত্ত হয়েছে তাতে দেখা যায় তিনি সিংহলরাজ হামিরশঙ্কের একমাত্র কন্যা। টডও বলেছেন:

He (Bheemsi) had espoused the daughter of Hamir Sank (Chohan) of Ceylon, the cause of woes unnumbered to the Sesodias. Her name was Pudmini.